গুচ্ছ।

(ছোট গল্প)

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত।

৬৫ নং সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩২১

মূল্য ১॥০ টাকা।

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১২নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পিতার চরণে

ভূমিকা।

এই গল্পগুলি যখন লিখিয়াছিলাম, তখন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কোন আত্মীয়ার বিশেষ আগ্রহে ইহার অধিকাংশ গল্পই প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। "পাগলের কথা" ও "নিয়তি"—প্রবাসীতে, "টমি" যমুনায়, "পথহারা" ও "পরিবর্ত্তন"—গল্পলহরীতে, "অভাগিনী," "প্রতীক্ষায়," "আহ্বান" ও "বিজয়া"—মানসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। "সোণার 'বালা," "ভবিতব্য" ও "বশীকরণ" অপ্রকাশিত।

কালকাতা।
১৫ই বৈশাখ ১৩২১।

সূচি।

গুচ্ছ।

পাগলের কথা

(গল্প)

লোকে বলে আমি পাগল হইয়াছি, আমার বন্ধুরা বলিয়া থাকেন যে আঘাত লাগিয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বাড়ীতে মেয়েরা বলিয়া থাকেন যে অধিক বিদ্যালাভ করিয়া আমার ভারাক্রান্ত মস্তিষ্ক একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে দেখিতে পাইতেছি যে আমার কিছুই হয় নাই, আমার মস্তিষ্ক বেশ সবল এবং সুস্থ আছে। এমন কিছু অধিক বিদ্যালাভ করি নাই বা এমন কিছু অধিক আঘাত লাগে নাই যাহার জন্য আমি উন্মাদ হইয়া যাইব। আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পূর্ব্বে, এখন সে কথা মনে হইলে একটু কষ্ট হয় মাত্র। আমি শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, সাধারণের

মতানুসারে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন ছিলাম। হাঁ, আর একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মা এবং বড় বৌদিদিকে আমি বরাবরই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি যে আমার মনের কোনও বিকার হয় নাই, যাহা কিছু হইয়াছিল সে অনেকদিন পূর্ব্বে সারিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি কোনমতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে আমার শরীর সুস্থ এবং নীরোগ।

আমার এই কাল্পনিক রোগের কারণ সুরেন। সুরেন আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী এবং প্রতিবেশী। বাল্যকাল হইতে আমরা উভয়ের সাথী। আমাদের বন্ধুত্ব গ্রামে উদাহরণ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। স্কুলে এবং কলেজে আমরা এক সঙ্গে পড়িয়াছি এবং বরাবরই একসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছি। সুরেন এখনও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং তাহারই জন্য তাহারই দোষে আমি এখন পাগল। সুরেনকে দেখিলে আমি এখন বড়ই চটিয়া যাই সেইজন্য সেও আর বড় একটা আমার সহিত দেখা করিতে আসে না। বাড়ীর লোকে বলে যে তাহাকে দেখিলে আমার রোগ আরও বৃদ্ধি হয়, সেইজন্যই সে আর আসে না; মা এবং বড় বৌদিদি এইজন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মেজদার ছোটমেয়ে সুধা আমাকে একদিন বলিয়াছিল যে, সুরেন কাকা কাছারী হইতে ফিরিবার পথে প্রত্যহ আমার সন্ধান লইয়া যায়। সুরেনকে দেখিলে এমন কি সুরেনের নাম শুনিলে বা মনে করিলে আমার কি মনে হয় জান? কোথা হইতে একটা অমানুষিক শক্তি আসিয়া আমার চোখের সম্মুখ হইতে কলিকাতা, বাসগৃহ, বিদ্যুতালোক এবং বর্ত্তমান সরাইয়া লইয়া যায়।

মুহূর্ত্তের জন্য আমি সাঁত বৎসর পিছাইয়া যাই ; দেখিতে পাই কীর্ত্তিনাশা-বক্ষে প্রবল ঝটিকাঘাতে তরঙ্গমালার উদ্দাম নৃত্য, দেখিতে পাই মাঝিরা পানসী রাখিতে পারিতেছে না, প্রবল বায়ুর সম্মুখে পড়িয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া নৌকা কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা কেহ বলিতে পারিতেছে না। ঝড়ের শ্রবণভেদী শব্দের মধ্য হইতে পরিচিত স্বরে কে যেন বলিতেছে "ভয় নাই" "ভয় নাই"। যখন চড়ায় লাগিয়া নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, নগদ দশ সহস্র মুদ্রা এবং অর্দ্ধ লক্ষের অধিক মূল্যের অলঙ্কার-জড়িত নববধূকে যখন কীর্ত্তিনাশা গ্রাস করিল, তখনও দূর হইতে কে যেন জড়িত স্বরে বলিতেছিল "ভয় নাই" "ভয় নাই"। বস্তুতঃ যখন বিবাহের যৌতুক সমেত আমার নববধূ পদ্মার গর্ভে আশ্রয় পাইতেছিল তখন আমার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভয়ের উদয় হয় নাই। তখন আমি কি ভাবিতেছিলাম জান? যে আমাকে অভয় দিতেছে, সে যেন আমার পরিচিত, সে যেন আমার প্রিয়, সে যেন আমাকে অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নৌকা যখন ডুবিল তখন পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নুটবিহারী মুখোপাধ্যায় অলঙ্কারের বাক্স, এবং সুরেন নববধূকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কি জানি কেন আমি তখন কাহাকেও বাঁচাইবার চেষ্টা করি নাই, নিজেও বাঁচিবার চেষ্টা করি নাই। যে আমাকে অভয় দিয়াছিল, সে যেন ক্রমশঃ নৌকার নিকটে আসিয়া বলিতেছিল "ভয় নাই" "ভয় নাই"। নৌকা যখন ডুবিল তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, অলঙ্কারের ভারে মুখোপাধ্যায় তলাইয়া গেল, পর্ব্বতপ্রমাণ একটা তরঙ্গ আসিয়া সুরেনের হাত হইতে নববধূকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। তখন আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সে স্বর লীলার। লীলার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারি নাই, এই ভাবিয়া, লজ্জায়

ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেলাম, জীবন-মরণের কথা তখন স্মরণ ছিল না। কিন্তু কীর্ত্তিনাশা আমাকে গ্রাস করিল না; কে যেন আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিল—সে করস্পর্শ বড় মধুর—আমার চির-পরিচিত। একাদশ বর্ষ পূর্ব্বে নব বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে প্রথম সে কর স্পর্শ করিয়াছিলাম, এই কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন ঝড়, নৌকা-ডুবি, কীর্ত্তিনাশা, জীবন, মরণ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভুলিয়া গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একটা বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। গ্রীষ্মের সিত পক্ষে লীলার অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া ছাদে শুইয়া আছি। লীলা বলিতেছে "দেখ, আমি বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিব না।" তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য মুষ্টি উত্তোলন করিতেছি, এমন সময় নীচে কে আমাকে ডাকিল। শুনিলাম মা বলিতেছেন "কে, সুরেন এলি? মণি ছাদে আছে।" ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া লীলা তাহার অঙ্ক হইতে আমার মস্তক নামাইয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেল। আমার নিকটে আসিয়া সুরেন যেন আমায় ডাকিল। তখন হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। লীলা যতদিন বাঁচিয়াছিল মাঝে মাঝে এমনই করিয়া সে আমাকে জ্বালাইত।

চাহিয়া দেখিলাম বারিকণাসিক্ত বালুকাসৈকতে শয়ন করিয়া আছি, সুরেন আসিয়া আমাকে ডাকিতেছে—আর দূরে আর্দ্র শুভ্র বসন পরিধান করিয়া আমার লীলা আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তখন বুঝিলাম আমি বর্ত্তমানে—ভবিষ্যতে নহি। যে কোন উপায়ে হউক লীলাকে ফিরিয়া পাইয়াছি। তখন উন্মত্তের ন্যায় "লীলা" "লীলা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, ঝড়ের সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া

আমার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। লীলা তাহা শুনিতে পাইল, হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সে যেন আমাকে ডাকিল। আমিও "যাই" বলিয়া তাহার দিকে ছুটিলাম, কিন্তু সুরেন আমাকে যাইতে দিল না। অকস্মাৎ কোথা হইতে তাহার দেহে অসুরের বল আসিল, আমি কিছুতেই তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারিলাম না। তাহাকে মিনতি করিয়া, পায়ে ধরিয়া, অবশেষে বল প্রয়োগ করিয়া, গালি দিয়া, প্রহার করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে কহিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না। আমার জন্য লীলা অনেকক্ষণ আর্দ্রবসনে পদ্মা-সৈকতে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ঝড়ের বেগ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, পূর্ব্বদিকে আলোকের ক্ষীণ রেখা দেখা দিল; হতাশ্বাস হইয়া লীলা বলিল "ওগো তুমি আসিবে না। আমি তবে যাই।" বড় করুণস্বরে লীলা কথাগুলি বলিল, তাহার কথায় আমার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আর একবার সুরেনের পায়ে ধরিয়া লীলার কাছে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, সে আমার কথা বিশ্বাস করিল না, হাসিয়া উঠিল, কিন্তু হাসির সহিত তাহার দুইটি অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। লীলা আবার বলিল "তবে যাই"। ধীরে ধীরে তাহার দেবদুর্ল্লভ মূর্ত্তি পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া গেল, আমি ক্রোধে, ক্ষোভে অধীর হইয়া সুরেনের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিলাম, না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। সেই অবধি আমি পাগল, সেই অবধি আমি সুরেনকে দেখিলে চটিয়া যাই, বাল্যবন্ধুর দর্শনে ক্রোধে ধৈর্য্যহারা হই। কিন্তু ইহার জন্য লোকে আমাকে পাগল বলে কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখিলাম রৌদ্র উঠিয়াছে, স্থরেন আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে, তাহার সিক্ত বসন রক্তাক্ত, শতধা ছিন্ন, সে তাহা গ্রন্থি দিয়া পরিধান করিয়াছে। উঠিয়া বসিলাম। লীলার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার যাতনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি মনে পড়িয়া গেল, তাহার শেষ বিদায়ের কথাগুলি মনে পড়িল, অবশেষে যে কঠিন শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া, তাহার শীর্ণ ওষ্ঠ দুটিতে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলাম সে কথা মনে পড়িল, তাহার ক্ষুদ্র জীবন অবসান হইলেও সে যে আমাকে বিস্মৃত হয় নাই, আসন্ন মরণ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া সে যে আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল, সে কথা মনে পড়িল। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; সহস্র সহস্র বৃশ্চিক যেন আমায় দংশন করিতেছিল, হঠাৎ যেন দিগন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলাম। দেখিলাম কিয়দ্দূরে মুখোপাধ্যায়ের দেহ তরঙ্গাঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নুটবিহারী পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, সে মরণেও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই, তখনও তাহার প্রাণহীন দেহ অলঙ্কারের বাক্স আকর্ষণ করিয়া ভাসিতেছিল। নুটবিহারী আমাকে বড় ভালবাসিত, শৈশবে আমাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, আমিও তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। একবার ভাবিলাম সে হয় ত বাঁচিয়া আছে, তাহাকে চেতন করিবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাহা পারিলাম না। চারিদিক আবার লাল হইয়া উঠিল, আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল, ছুটিয়া পলাইয়া গেলাম। কোথায় দিয়া কোন্ দিকে যাইতেছিলাম মনে নাই। অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল, সূর্য্যের তেজ তখন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে উত্তপ্ত



পাগলের কথা।

বালুকারাশির উপরে লাল চেলী পরিয়া একটি বালিকা শয়ন করিয়া আছে। ভাবিলাম অগ্নিবৎ তপ্ত বালুকা কি তাহার দেহ দগ্ধ করিতেছে না? তাহার নিকটে সরিয়া গেলাম, দেখিলাম সে যেন কাহার নবপরিণীতা বধূ। বহুমূল্য মণিমুক্তাগুলি সুবর্ণের আসনে বসিয়া তাহার দেহের চারিদিক হইতে হাসিয়া উঠিল, আমাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, কিসের জন্য তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মৃণাল-কোমল বাহুমূলে মস্তক রক্ষা করিয়া বালিকা ঘুমাইতেছিল, আমি তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া ডাকিলাম, স্পর্শে বুঝিলাম সে ঘুম ভাঙ্গিবার নহে। আবার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, কীর্ত্তিনাশার শত শত তরঙ্গ তাহার সীমন্ত হইতে সিন্দূর-লেখা দূর করিতে পারে নাই, কপালের স্থানে স্থানে তখনও চন্দন-রেখা স্পষ্ট রহিয়াছে, সে যে আমার নব-বিবাহিতা, কাল সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধ পিতা যে তাহাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিলাম বুড়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, আর মনে করিতেছে তাহার কন্যা নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুরগৃহে পৌঁছিয়াছে। তাহার বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি দেখিয়া লোকে হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছে। এই কথা ভাবিয়া হাসি পাইল। হঠাৎ দেখিতে দেখিতে চেলীখানা যেন ঘোর লাল হইয়া উঠিল, পদ্মার জল লাল হইয়া উঠিল, শুভ্র বালুকা-সৈকত লাল হইয়া গেল, আকাশ লাল হইয়া উঠিল, জ্ঞানহীন হইয়া আবার ছুটিলাম। অনেকক্ষণ পরে মনে হইল কোথা হইতে শীতল বাতাস আসিয়া আমার কপাল স্পর্শ করিতেছে, আমি ধীরে ধীরে নদীতীরে চলিয়া বেড়াইতেছি, তখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিলাম, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ডাকিলাম

"লীলা!" ফিরিয়া দেখিলাম ছায়ার ন্যায় সুরেন আমার পশ্চাতে আসিতেছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতায় পড়িতে গিয়াছিলাম তখন হইতেই সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছিলাম যে নিজে না দেখিয়া বিবাহ করিব না। পিতা আমার বিবাহ দিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মত না থাকায় বিবাহ হইয়া উঠে নাই। ক্রমে একে একে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গেলাম, বিবাহের বাজারে আমার দর বাড়িল, অনেক কন্যাভারগ্রস্ত আমার হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু কিছুতেই আমার মন টলিল না। অবশেষে সুরেনই আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল। কথার ছলে আমার অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিজ্ঞা বাহির করিয়া লইয়া আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিল। কলিকাতার মেসে থাকি—কলেজে পড়ি, আত্মীয় স্বজনের অত্যন্ত অভাব, এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুরেন বলিল, তিনি তাহার আত্মীয়। পরে শুনিয়াছিলাম সুরেনের বংশে কেহ কখনও তাহার নামও শুনে নাই। আহারের সময় মলিন-বস্ত্র-পরিহিতা একটি বালিকা আসিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে আমাদিগকে পরিবেশন করিয়া গেল। মেসে ফিরিয়া সুরেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মেয়েটী কেমন?" আমি সংক্ষেপে উত্তর করিলাম "মন্দ নয়।" এক সপ্তাহ পরে শুনিলাম আমার বিবাহ। সুরেন এমন ভাবে সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল যে আর আপত্তি করিবার সুবিধা পাইলাম না।

বসন্তোৎসবের দিনে মহাসমারোহে লীলাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলাম। বড়ই সুখে বিবাহিত জীবনের তিন বৎসর কাটিয়াছিল, এখনও সে কথা মনে করিলে স্বপ্নের মত বোধ হয়। লীলাকে দেখিলে যূথিবন বলিয়া ভ্রম হইত। ভাবিতাম স্পর্শ করিলেই ঝরিয়া পড়িয়া যাইবে। যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইল, প্রথম প্রসব-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার যূথিবন সত্য সত্যই ঝরিয়া গেল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল "আমি তোমার কাছে থাকিতে পারিলাম না, তুমি কিন্তু আমায় ভুলিও না।" আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে সে চলিয়া গেল।

এই তিন বৎসরের মধ্যে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকিল হইয়াছিলাম, লীলার সহিত আশা ভরসা সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, সুতরাং ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে পুনরায় বিবাহের জন্য প্রস্তাব আসিতে লাগিল, আমার উপর রীতিমত উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পিতার কাতরতা, মাতার অশ্রুজল, ভ্রাতৃবধূগণের সবিনয় অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বিবাহ করিতে স্বীকার করিলাম। যে দিন মাতার নিকট বিবাহ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলাম সেই দিন রাত্রিকালে লীলার শয়নকক্ষে একাকী শুইয়াছিলাম। মহানগরীর কলরব তখন থামিয়া আসিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের মধ্যভাগে নিশীথে ক্ষীণচন্দ্রালোক দেখা দিয়াছে, গ্রীষ্মকাল, গৃহের দরজা-জানালাগুলি খোলা রহিয়াছে। কোথা হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া গেল, সেই সময় দূরে কে যেন হা-হা-হা করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া

উঠিলাম। লীলা চলিয়া যাইবার পরে আমার চিন্তার শেষ ছিল না, নূতন বিবাহের প্রস্তাব হইয়া সে চিন্তা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে সেই সময়ে ঘরের ভিতর কে যেন আবার হা-হা—করিয়া উঠিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিল না, মনে হইল সে ঘরে সে হাসি যেন নূতন নহে, তাহার কণ্ঠস্বর যেন চির-পরিচিত। ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ করিয়া শুভ্রবসন-পরিহিতা রমণীমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, যেন স্পষ্ট দেখিলাম অবগুণ্ঠনাবৃতা নারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। তখন আমি সুপ্ত কি জাগ্রত বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার আকার, চলনের ভঙ্গী সমস্তই আমার পরিচিত, তাহার কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সমস্ত অবয়ব যেন আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। সে আমারই লীলা, অপর কেহ নহে। লীলা ঘরে ঢুকিয়া মুখ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল, আমি চিরদিন তাহাকে যেমন ভাবে ডাকিতাম তেমন ভাবেই ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু সে যে ভাবে আমার নিকট আসিত সে ভাবে যেন আসিল না। সে আসিল বটে কিন্তু দূরে রহিল, ভাবে বুঝাইয়া দিল যে এখন আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে, মিলনের একটা বাধা হইয়াছে, তখন আমার মনে ছিল না যে লীলা আর আমার নাই। রজনীর অধিকাংশ লীলার সহিত কথায় কাটাইয়াছিলাম। যখন জানালা দিয়া রৌদ্র আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল তখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম অতি সন্তর্পণে শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া আছি। একবার ভাবিলাম স্বপ্নে লীলাকে দেখিয়াছি, আবার ভাবিলাম স্বপ্নের ত সকল কথা মনে থাকে না, কিন্তু গত রাত্রির প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে রহিয়াছে। সে বলিয়া গিয়াছে আমি তাহারই,

আর কাহারও নহি, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে আমি তাঁহারই থাকিব, আর কেহ আমাকে অধিকার করিতে পারিবে না। লীলার কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছিল, তখনও যেন লজ্জায় ঘৃণায় মরমে মরিয়া যাইতে-ছিলাম, সেই আমি অপরের হইতে চলিয়াছি। লীলা বলিয়া গিয়াছে সে ছায়ার মত আমার অনুসরণ করিবে, আমি তাহারই সম্পত্তি থাকিব, সহস্র বার বিবাহ করিলেও তাহার সহিত সম্বন্ধ লোপ হইবে না। আমি ত তাহাকে ভুলিয়াছি কিন্তু মরিয়াও সে আমাকে বিস্মৃত হয় নাই।

তাহার কথা বলিতে গেলে ঐ রকম করিয়া চারিদিক লাল হইয়া আসে, চারিদিক কেন লাল হইয়া যায় বলিতে পারি না, আমার শিরায় শিরায় কেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহা জানি না। সব বুঝিতে পারি, সমস্তই দেখিতে পাই, কিন্তু সময়ে সময়ে লালের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই না। তবুও বলিতেছি তোমরা যাহা মনে করিয়া থাক তাহা সত্য নহে, আমি কখনও পাগল হই নাই। কি বলিতেছিলাম—বিবাহের কথা? নগদ দশ সহস্র রজতখণ্ড ও অর্দ্ধলক্ষাধিক মূল্যের অলঙ্কার-মণ্ডিতা দশম বর্ষীয়া বালিকার পরিবর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলাম। নূতন শ্বশুরালয়ে যাইতে হইলে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে গিয়া লৌহজঙ্গ হইতে নৌকা গ্রহণ করিতে হয়! যাইবার সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল! অশনি গর্জ্জনের মধ্যে সম্প্রদান কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসরে উল্লসিতা রমণীবৃন্দ যখন আনন্দোৎসবে উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমি যেন কাহার কলহাস্য শুনিতেছিলাম, কে যেন ঘরের চতুষ্পার্শ্বে অন্তরালে থাকিয়া আমাকে ব্যঙ্গ

করিতেছিল, যেন বলিতেছিল সহস্র সহস্র বিবাহ করিলেও তুমি আমার থাকিবে, অপরের হইতে পারিবে না। বাসর-শয্যায় চন্দন-মাল্য-চর্চ্চিত হইয়া যেন আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিতেছিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম হয়ত লীলা অন্তরাল হইতে আমাদের দেখিতেছে, সে আমার লীলা, কতবার শপথ করিয়া তাহাকে বলিয়াছি যে, ইহপরকালে আমি তাহারই, অপরের নহি।

বরবধূ যখন বিদায় হইল তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। বিলম্ব হইবার ভয়ে সুরেন নৌকা ছাড়িয়া দিল, যখন ঝড় উঠিল তখন ক্ষুদ্র নৌকা কীর্ত্তিনাশার মধ্যস্থলে। তাহার পর যাহা হইল তাহা বলিয়াছি। পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, মাতার সাধের বধূ, দশ সহস্র অখণ্ড মণ্ডলাকার কীর্ত্তিনাশার চরে রাখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আমি তাহারই, অপরের নহি।

নিয়তি

বিল্বাকাঠীর জীবনমোহন চৌধুরী যশোহরের একজন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার, লোকে বলিত তাঁহার প্রবল প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত। জীবনমোহন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, বঙ্গদেশের অধ্যাপক-সমাজ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী ছিল, তাহা ছাড়া ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহার বড়ই ব্যয়বাহুল্য দেখা যাইত। জীবনমোহনের একমাত্র পুত্র প্রাণমোহন, পিতার ঐকান্তিক যত্নে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে পুত্রের বিবাহ দিয়া বৃদ্ধ জীবনমোহন পৌত্রমুখ দর্শনের ভরসায় বসিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। হইবে না হইবে না করিয়া প্রাণমোহনের পত্নী প্রমোদাসুন্দরী যখন একটি কন্যা প্রসব করিলেন, তখন বৃদ্ধ যেন চাঁদ হাতে পাইলেন, আদর করিয়া পৌত্রীর নাম রাখিলেন মাধুরী। বৃদ্ধ বয়সে জীবনমোহন বিষয়কর্ম্ম বড় দেখিতেন না, সুশিক্ষিত পুত্রের হস্তে বিস্তৃত জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ নিশ্চিন্তমনে পৌত্রীকে লইয়া দিন যাপন করিতেন। মাধুরী তাঁহার নয়নের তারা হইয়া উঠিয়াছিল, মাধুরীর জন্য তাঁহার কাশীবাস করা হয় নাই। কেহ যদি বলিত যে বড় বাবুর একটি পুত্র সন্তান হইলে ভগবান কর্ত্তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি তাহার কথা চাপা

দিয়া বলিত "ও কথা বলিও না, একা মাধু আমার শত পুত্রের কাজ করিবে।" মাধুরী সত্য সত্যই মাধুর্য্যময়ী হইয়া উঠিল; যে তাহাকে একবার দেখিত, সে নয়ন ফিরাইয়া লইতে পারিত না। প্রতিদিন প্রভাতে মাধুরী যখন বৃদ্ধ পিতামহের হস্ত ধারণ করিয়া বিশাল পুষ্পোদ্যানে খেলিয়া বেড়াইত, তখন তাহাকে দেখিলে অপ্সরী বা দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম হইত।

জীবনমোহন দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দ্বারা পৌত্রীর জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও বিশেষ কারণে তিনি সর্ব্বদাই অস্থিরচিত্ত ও অসন্তুষ্ট থাকিতেন। বিদ্যাকাঠী গ্রামে বিদায়ের লোভে কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ বা গ্রহাচার্য্য আসিলে তাঁহার আর সমাদরের অবধি থাকিত না। এইরূপে মাধুরীর শত শত জন্মপত্রিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। একবার মাত্র বিক্রমপুরনিবাসী কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বকায় এক ব্রাহ্মণ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। সেদিন মাধুরী পিতামহের পার্শ্বে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ আসিয়া সভাতলে বসিল, কাগজ কলম লইয়া জন্মপত্রিকা লিখিতে লাগিল, কিন্তু কি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, আর লিখিল না, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন ত্রস্ত হইয়া জীবনমোহন তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ যখন কাতর হইয়া ধরিয়া পড়িলেন তখন ব্রাহ্মণ বলিল "বাবু নিয়তি কেহ খণ্ডাইতে পারে না, অর্থব্যয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নে যদি লোকে নিয়তির হাত এড়াইতে পারিত, তাহা হইলে জগতে শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু থাকিত না।" মর্ম্মাহত হইয়া বৃদ্ধ বসিয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণ তখনও বলিতেছিল, "শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা

আমাদের উদর পূরণের উপায়। গণনার যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অর্থের জন্য আপনার নিকট মিথ্যা বলিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; বিদায়, পাথেয় প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিল। তাহার পর সে কৃষ্ণকায় জ্যোতিষীকে বিদ্যাকাঠী গ্রামে কেহ দেখে নাই। জীবনমোহন তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশাল বঙ্গদেশের বক্ষোদেশে সে কোথায় লুকাইয়াছিল তাহা কেহ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। মাধুরীর বয়স যত বাড়িতেছিল জীবনমোহনের বিষণ্ণতাও তত বাড়িতেছিল। পুত্রের নিকটে মাধুরীর ভবিষ্যতের কোন কথা বলিয়া বৃদ্ধের মনের তৃপ্তি হইত না, কারণ পুত্র নব্যতন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি কুসংস্কারের সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন।

মাধুরীর বিবাহের বয়স হইল। প্রমোদাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল যে অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ছলে একটি দরিদ্রের পুত্র ক্রয় করিয়া লালনপালন করেন, কিন্তু জীবনমোহন তাহাতে অমত করিলেন। প্রমোদাসুন্দরী গৌরীদানে শ্বশুরের অমত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে জীবনমোহন নিষ্ঠাবান হিন্দু। দেখিতে দেখিতে মাধুরী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জীবনমোহন পৌত্রীর বিবাহের জন্য যত্নবান হইলেন। প্রাণমোহন কোনদিনই মাধুরীর বিবাহের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, তাঁহার বিশ্বাস ত্রয়োদশবর্ষ উত্তীর্ণ না হইলে কুমারীর বিবাহ হওয়া উচিত নহে। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসমাজে কর্ত্তৃত্ব করিয়া, কুলাচার্য্য ও গ্রহাচার্য্যগণের উদর পূরণ

করাইয়া, অবশেষে জীবনমোহন মাধুরীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। পাত্র কলিকাতা-নিবাসী, ধনীর সন্তান, কলিকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের ছাত্র, প্রিয়দর্শন এবং মিষ্টভাষী। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বৃদ্ধের মুখে হাসি দেখা দিল। যথাসময়ে মহাসমারোহে জীবনমোহন সৎপাত্রে পৌত্রীকে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মাধুরীর দুইটি অলঙ্কার বাড়িল,—সীমন্তে সিন্দূর ও মস্তকে অবগুণ্ঠন।

তখন কলিকাতা মহানগরীতে মহামারী দেখা দিয়াছে। প্রতি বৎসর শীতের শেষে গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠে, গঙ্গাতীরে শবদাহের স্থানাভাব হয়। একদিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় টেলিগ্রাম পাইয়া পিতাপুত্র কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গিয়াছে, শমন একটি সুকুমার জীবনের সহিত মাধুরীর জীবনের সকল সুখ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। পিতাপুত্রে মস্তকে হাত দিয়া বৈবাহিকের প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলেন। তখন অন্তঃপুর হইতে পুত্রশোকাতুরা মাতা উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাদিগকে গালি দিতেছিল। শুষ্কমুখে মাধুরীর শ্বশুরগৃহ পরিত্যাগ করিয়া জীবনমোহন ও প্রাণমোহন বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধ পুত্রকে জানাইলেন যে তিনি এখন আর দেশে ফিরিতে পারিবেন না, তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইবেন। ভগ্নহৃদয়ে বিষণ্ণ বদনে গৃহে ফিরিয়া প্রাণমোহন একমাত্র কন্যার সর্ব্বনাশের কথা প্রকাশ করিলেন। মাধুরী কিছুই বুঝিল না, কারণ সে বিবাহের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে স্বামীকে দেখে নাই, স্বামী কে তাহা বুঝিতে শিখে নাই, স্বামীর অভাব কি তাহা অনুভব করে নাই। প্রমোদাসুন্দরী ভূতলে লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া কন্যাও কাঁদিতে বসিল;

আর, তাহার অশ্রুজল দেখিয়া বিত্থাকাঠী গ্রামের কেহই অশ্রুজল রোধ করিতে পারিল না।

জামাতার শোক প্রাণমোহনের বুকে বড় বাজিল। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁহার আনন্দ বা শোক লোকে জানিতে পারিত না, তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবারও কেহ ছিল না। চৌধুরীদিগের গৃহে প্রমোদাসুন্দরীই গৃহিণী, প্রাণমোহনের মাতা বহুপূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

যেমন করিয়া সকলের দিন কাটিয়া থাকে মাধুরীর দিনও তেমনি করিয়া কাটিতে লাগিল। ক্রমে মাধুরী বিবাহের কথা ও স্বামীর কথা ভুলিয়া গেল। মাধুরীর মাতা প্রাণ ধরিয়া তাহার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইতে পারেন নাই, কিশোরী কন্যাকে হিন্দু বিধবার কঠোর জীবনব্রত অবলম্বন করাইতে পারেন নাই। ইহার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইতেছিল।

এক বৎসরের অধিককাল তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়া জীবনমোহন যখন দেশে ফিরিলেন তখন পূর্ব্বের ন্যায় হাসিমুখে সালঙ্কারা নববধূর মত মাধুরী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেল। তাহার দাদাবাবু যে এতদিন তাহাকে কি করিয়া ভুলিয়া ছিলেন তাহা সে ভাল বুঝিতে পারে নাই। যখন তাহাকে দেখিয়া জীবনমোহনের বিষণ্ণমুখ আরও বিষণ্ণ হইয়া গেল তখন মাধুরীর মুখও শুকাইয়া গেল, চিরাভ্যস্ত অভ্যর্থনা ভুলিয়া গিয়া মাধুরী ধীরে ধীরে পিছাইয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া জীবনমোহন মাধুরীর বেশ পরিবর্ত্তন ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মাধুরীর অঙ্গে সধবার চিহ্ন রাখার

জন্য পুত্রবধূকে বড় তিরস্কার করিলেন। মাধুরীর মাতা ভূমিশয্যায় লুটাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। পিতামহের উপদেশ অনুসারে মাধুরী অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল, সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া ফেলিল, একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করিল ; সাত দিনের মধ্যে ফুলের মত সুকুমার মাধুরী যেন শুকাইয়া উঠিল! সে প্রথম প্রথম তর্ক করিয়া বৃদ্ধ পিতামহকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিধবা হইলে মাছ খাইতে নাই কেন, থান পরিতে হয় কেন, স্বামী কে, ইত্যাদি যে-সমস্ত প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই সেইগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বৃদ্ধকে সেই বালিকা নির্ব্বাক করিয়া দিত।

কন্যার পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রমোদাসুন্দরী শয্যা আশ্রয় করিলেন, মাধুরীকে দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাণমোহন অন্তঃপুরে আসা ত্যাগ করিলেন।

মাধুরী একে একে সব শিখিল, সব বুঝিল, তখন সে বালসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিল।

জীবনমোহন মাধুরীর শিক্ষা শেষ করিয়া পুনরায় তীর্থভ্রমণে চলিয়া গেলেন। তখন মাধুরী বড় বিপদে পড়িল। একাকী তাহার দিন আর কাটে না। পিতামহের উপদেশ-মত যতক্ষণ সময় পাইত শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়িত, সংসারের কাজ তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইত না, প্রমোদাসুন্দরী নিজেও কিছু দেখিতেন না, আত্মীয়াগণ সমস্তই সম্পন্ন করিতেন। মাধুরী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পিতামহের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় রহিল।

চৌধুরীদিগের অন্নে অনেক লোক প্রতিপালিত হইত। প্রাণমোহনের পিতা গ্রামে যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার শিক্ষকবর্গ প্রাণমোহনের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে জীবনমোহন এক অনাথ ব্রাহ্মণসন্তানকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কান্তিচন্দ্র গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া সেইখানেই শিক্ষক হইয়াছিল। জীবনমোহন অনেকবার তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। কান্তি আত্মীয়-স্বজন ও অর্থের অভাব জানাইয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। প্রাণমোহনের ইচ্ছা ছিল যে মাধুরীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু জীবনমোহনের মত না হওয়ায় তাঁহার আশা সফল হয় নাই। মাধুরী বিধবা হইবার পরে প্রাণমোহন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কান্তির সহিত মাধুরীর পুনরায় বিবাহ দিবেন। জীবনমোহন দ্বিতীয়বার তীর্থপর্য্যটনে নির্গত হইলে প্রাণমোহন একদিন স্ত্রী ও কন্যার নিকটে নিজের মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রমোদাসুন্দরী পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন, মাধুরী কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল, কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সে বলিল পিতামহের নিকট শুনিয়াছে হিন্দুর কন্যার একবারের অধিক বিবাহ হয় না, সে কিরূপে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে। প্রাণমোহন প্রথমদিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু বারম্বার বলিয়াও যখন কন্যার মত করাইতে পারিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে মাধুরীকে বিবাহ করিতেই হইবে।

সেইদিন হইতে মাধুরী অন্ধকার দেখিল। কথা গোপন রহিল না, ক্রমে গ্রামের লোকে কাণাঘুষা করিতে লাগিল, দেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল

প্রাণমোহন চৌধুরী বিধবা কন্যার বিবাহ দিবে আত্মীয় স্বজন অনেকেই ধর্ম্মভয় ও সমাজের ভয় দেখাইয়া প্রাণমোহনকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বড় বেশী কথা কহিতেন না! কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। কান্তি বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল, প্রাণমোহন যখন তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন তখন সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, নীরবে মুখ নত করিয়া রহিল। প্রাণমোহন ভাবিলেন বিবাহে তাহার সম্মতি আছে। তখন তিনি বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন।

মাধুরী যখন বুঝিল যে পিতা তাহার বিবাহ দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তখন আকুল হইয়া পিতামহকে সংবাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইল। জীবনমোহন কোথায় গিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না, তিনি অর্থের আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে দুই একখানি পত্র লিখিতেন মাত্র, তারপর আর কোন ঠিকানা পাওয়া যাইত না। মাধুরী অনেক সন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাইল না।

প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রাণমোহন বঙ্গদেশের পণ্ডিতসমাজের নিকট হইতে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা আনাইয়াছিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল; গৃহে উৎসব আরম্ভ হইল। বিবাহের দিন প্রভাতে যখন নহবৎ বাজিয়া উঠিল তখন মাধুরী ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, সমস্ত দিনে কেহ আর তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। সন্ধ্যাসমাগমে প্রাণমোহন যখন কন্যাদান করিতে প্রস্তুত হইলেন, কান্তি যখন বরবেশে সভায় উপস্থিত হইল, তখন মাধুরীকে আর কেহ খুঁজিয়া



শেষ রাত্রিতে জেলিয়ারা খালে মাছ ধরিতে গিয়া একটা গুরুভা'র

পাইল না। ব্যাকুল হইয়া প্রাণমোহন স্বয়ং গ্রামের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আকস্মিক বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া প্রমোদাসুন্দরী শোকশয্যা ত্যাগ করিলেন ও কন্যার সন্ধান করিতে ব্যস্ত হইলেন, কান্তি বরবেশ ত্যাগ করিয়া মাধুরীর সন্ধানে নির্গত হইল।

ক্রমে বিপদ্ বুঝিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সরিয়া পড়িল, আলোকমালা নিবিয়া গেল, গ্রামের লোকে বাদ্যধ্বনির পরিবর্ত্তে শোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল। রজনী শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাণমোহন হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু কান্তি আর চৌধুরীদিগের গৃহে ফিরিল না।

শেষ রাত্রিতে জেলিয়ারা খালে মাছ ধরিতে গিয়া একটা গুরুভার পদার্থ টানিয়া তুলিল। জাল উঠাইয়া সভয়ে দেখিল যে উহা একটি রমণীর মৃতদেহ। তাহারা যখন ঘাটে নৌকা লাগাইল তখন দেখিল কে যেন তাহাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ক্রমে ঘাটে লোক জমিয়া গেল, কোথা হইতে কান্তি আসিয়া যখন মৃতাকে মাধুরী বলিয়া ডাকিল তখন লোকে জানিল প্রাণমোহন চৌধুরীর কন্যা মরিয়াছে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। তখন সেই ঘাটে নিরুদ্বেগে বসিয়াছিল একজন কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সে যেন মাধুরীর মৃতদেহেরই অপেক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে প্রাণমোহন সংবাদ পাইলেন। তাঁহার মুখে শোকের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, মুখ যেন আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। প্রমোদাসুন্দরীর রোদনধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে কোথা হইতে তীরবেগে একখানা পান্‌সি আসিয়া ঘাটে লাগিল। একজন বৃদ্ধ

তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন, জনতা দেখিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। গ্রামের লোকে সসম্ভ্রমে বৃদ্ধ জীবনমোহন চৌধুরীকে পথ ছাড়িয়া দিল। মৃতদেহ দেখিয়া বেদনাক্লিষ্টকণ্ঠে বৃদ্ধ একবার শুধু ডাকিলেন "মাধু!" তাহার পর নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেহ ভরসা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হইল না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল—"বাবু, আমি সেই গণনার বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

প্রতীক্ষায়।

তখন ভয়ানক শীত। শীতকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া শীতের মাত্রা চড়াইয়া দিয়াছে। এক্কাযোগে হামিরপুর হইতে নসিরাবাদ যাইতেছিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। অনেক দিন পরে আবার এইদেশে আসিয়াছি এবং নাতিনীর নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া যৌবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

রসুলপুরের চটী তখন একটা বড় বাজার ছিল। কানপুর, হামিরপুর, ললিতপুর প্রভৃতি জেলার অনেকগুলি পথ রসুলপুর গ্রামের প্রান্তে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এখন রসুলপুর গণ্ডগ্রাম, কারণ রেলপথ সেখান হইতে দশ ক্রোশ দূর দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

রসুলপুরে দুইদিন বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিনে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম। দোকানদার অনেক নিষেধ করিল, আকাশের দুই এক স্থানে মেঘ দেখাইয়া বলিল যে, আজ পথ চলিতে আরম্ভ করিলে বিশেষ কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা। তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যাত্রা করাই স্থির করিলাম। পথে দুই চারিদিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, নসিরাবাদে শীঘ্র পৌছিতে না পারিলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কয়েকদিন হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, পথ ঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়া গিয়াছে, রাস্তায়

অত্যন্ত কাদা হইয়াছে। তথাপি যাত্রা করাই স্থির করিলাম। অপরাহ্ণে বাক্স ও বিছানাটী এক্কায় চাপাইয়া রসুলপুর হইতে রওনা হইলাম।

আমি ভাবিয়াছিলাম যে রসুলপুর হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে সলিমাবাদের চটীতে আশ্রয় লইব; কিন্তু দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে না করিতে কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল, ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইল, তাহার সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এক্কা তখনও ধীরে ধীরে চলিতেছিল, কিন্তু অন্ধকার ক্রমে ঘন হইয়া আসিল, পথ আর দেখা যায় না। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার সারথি জিজ্ঞাসা করিল "বাবুজি, কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না। কি করিব?" আমি বলিলাম "এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে ত শীতে মরিতে হইবে; ঘোড়ার রাশ ঢিল করিয়া দাও, সে নিজেই অন্ধকারে পথ দেখিয়া চলিবে। ধীরে ধীরে চলিলে কোনও সময়ে চটীতে পৌঁছিতে পারিব।" এক্কাচালক তাহাই করিল। অশ্ব ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলাম চারিদিকে জল; যত দূর দৃষ্টি যায় জল ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না; নদীনালা জলে ভরিয়া গিয়াছে, মানুষের আবাসের চিহ্নমাত্রও নাই। মনে বড় ভয় হইল, এক্কা-চালককে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাপু, তুমি পথ চিনিতে পারিতেছ ত?" উত্তরে সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে সে পুরুষানুক্রমে এক্কা চালাইয়া আসিতেছে এবং হাজার বার এই পথে গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্য্যোগেও কখনও পথ হারায় নাই। কি জানি কেন তাহার কথায় আমার বিশ্বাস হইল না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমার মনে হইল যে আমরা পথ হারাইয়াছি এবং বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। সময়ে সময়ে ঘোড়া পথ না পাইয়া

দাঁড়াইতেছিল, একার চাকা দুইখানি গাছের গুঁড়িতে ঠেকিয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমার সারথি আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, ঠিক পথেই চলিতেছে। অল্পক্ষণ পরে মনে হইল আমরা উচ্চে উঠিতেছি; তাহার পরেই ঘোড়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুতের আলোকে দেখিলাম সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা।· এক্কাচালক তখন বাধ্য হইয়া এক্কা ফিরাইল, দীর্ঘিকার পার্শ্ব হইতে এক্কা আসিয়া সমতলক্ষেত্রে পড়িল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই সম্মুখে বাধা পাইয়া ঘোড়াটি পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি এক্কা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। দেখিলাম সম্মুখে একটী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ঘোড়া তাহাতেই আঘাত পাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। উভয়ে এক্কা হইতে নামিয়া ঘোড়াটিকে তুলিলাম। এই সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, দেখিলাম দূরে একটা ধূসরবর্ণ স্তূপ; বোধ হইল উহা কোন বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিলে এক্কাচালককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে কিছু চিনিতে পারিতেছে কি না। সে বলিল "না।" আমি তখন তাহাকে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া দিলাম। তখন তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; সে বলিল "বাবুজি, আপনি এক্কায় উঠিয়া বসুন, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাই, এই স্থান বড় ভাল নহে, ইহা সয়তানের আবাস।" আমি তাহার কথা উড়াইয়া দিবার জন্য হাসিয়া উঠিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না, বরং অধিক আগ্রহের সহিত আমাকে এক্কায় উঠিতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

বৃষ্টিতে গায়ের সমস্ত কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, ঝড় উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, এক একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া যেন অস্থিভেদ করিয়া মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এমন অবস্থায় উপস্থিত আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে

পারিলাম না। একাওয়ালা যখন বুঝিল যে, আমি সে স্থান ত্যাগ করিব না, তখন সে স্পষ্ট বলিল যে "আপনার থাকিতে ইচ্ছা হয় থাকুন, আমি এস্থানে রাত্রিবাস করিয়া প্রাণ দিতে পারিব না।" এই বলিয়া যখন সে আমার বাক্স ও বিছানা নামাইয়া দিবার উদ্যোগ করিল তখন আমি বাধ্য হইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম এবং বলপূর্ব্বক একা হইতে নামাইয়া দিলাম। তখন দেহে বল ছিল, স্বচ্ছন্দে দুইটা লোককে কাবু করিতে পারিতাম। একাওয়ালা প্রথমে বলপ্রয়োগ করিয়া দেখিল, কিন্তু যখন বুঝিল যে জোর করিয়া পলাইবার উপায় নাই, তখন সে কাকুতি মিনতি করিতে ও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন একার লণ্ঠনটি খুলিয়া লইলাম এবং একহাতে লণ্ঠন ও অপর হাতে একাওয়ালার হাত ধরিয়া প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইলাম। বিদ্যুতের আলোকে দেখিলাম বড় বড় পাথর দিয়া প্রাচীরটি নির্ম্মিত, তাহাতে বড় বড় গাছ জন্মিয়াছে ও স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একটা ভগ্নস্থান দিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিলাম। ভিতরে কেবল জঙ্গল, স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, বিদ্যু-তের আলোকের সাহায্যে ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। প্রায় পনের মিনিট পরে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। অট্টালিকাটি প্রস্তরনির্ম্মিত, সম্মুখে বড় বড় খিলানযুক্ত বারান্দা; তাহার দুই একটি খিলান পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই তখনও দাঁড়াইয়া আছে। বারান্দায় উঠিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম, তাহার পর ভাবিলাম বিছানা ও বাক্স একায় পড়িয়া থাকিলে ভিজিয়া যাইবে, ঘোড়াটাও পলাইয়া যাইতে পারে, সুতরাং সেগুলিকেও এই স্থানে আনিয়া রাখা উচিত। একাওয়ালা একা যাইতে অসম্মত হওয়ায় অগত্যা তাহার হাত ধরিয়া বাহির হইলাম।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পথ চলিয়া এক্কার নিকটে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঘোড়াটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে করুণস্বরে ডাকিতেছে। আমার আদেশে এক্কাওয়ালা ঘোড়া খুলিল ও বাক্স এবং বিছানা মাথায় করিয়া লইল। আমি একহাতে লণ্ঠন ও একহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইলাম।

অন্ধকারে পথ চিনিতে না পারিয়া প্রথমে বারান্দার যে স্থানে উঠিয়াছিলাম সেস্থানে পৌঁছিতে পারিলাম না। এইবারে অট্টালিকার যে অংশে পৌঁছিলাম সেস্থানে বারান্দার অধিকাংশ খিলানগুলিই পড়িয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম যে বৃষ্টির জল আসিয়া সেস্থানটি আশ্রয়ের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এক্কাওয়ালা একটি থামে ঘোড়া বাঁধিয়া আর একটী থামের আশ্রয়ে বাক্স ও বিছানা রাখিল। বারান্দার পশ্চাতে অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে বলিয়া বোধ হইল, কারণ আলোক দেখিয়া অনেক বাদুড় ও চামচিকা ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি প্রস্তাব করিলাম যে ঘোড়া এইখানে রাখিয়া আমরা ঘরের ভিতর আশ্রয় লই। এক্কাওয়ালা তাহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিল। সে বলিল যে, এই বাড়ীতে সয়তান ও জিন ব্যতীত আর কেহই বাস করে না; আমরা যদি এই বারান্দায় রাত্রিযাপন করিয়া সকালে প্রাণ লইয়া পলাইতে পারি তাহা হইলেই মঙ্গল, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলে আর কাহাকেও ফিরিতে হইবে না। আমি তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একহাতে তাহাকে ধরিয়া ও অপর হাতে লণ্ঠন লইয়া প্রথম ঘরে প্রবেশ করিলাম।

সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতে

লাগিলাম, কিন্তু কোথায়ও উপযুক্ত স্থান পাইলাম না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলানের ভিতর দিয়া শন্ শন্ করিয়া তুষার-শীতল বায়ু ছুটিয়া আসিয়া হাড় কাঁপাইয়া দিতেছিল, বৃষ্টির জল আসিয়া ঘরের মেঝে ভরিয়া গিয়াছিল। কোনস্থানেই আশ্রয় পাইলাম না। চারি পাঁচটি ঘর ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। এক্কাওয়ালা তখন শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, ভাবিলাম বারান্দায় ফিরিয়া যাই। ফিরিবার চেষ্টা করিয়া দেখিলাম অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর একটি বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ক্লান্ত হইয়া তাহার একটা থামের আড়ালে বসিয়া পড়িলাম। এক্কাওয়ালা আমার অবস্থা বুঝিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া চারিদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ হানিতেছিল। দেখিলাম যেখানে বসিয়া আছি তাহা অট্টালিকার প্রাঙ্গণের বারান্দা, প্রাঙ্গণটি চতুষ্কোণ এবং তাহার চারিদিকে দ্বিতল গৃহ। ভাবিলাম অট্টালিকাটি যখন দ্বিতল, তখন ইহার কোন না কোন অংশে সিঁড়ি আছে এবং তাহা দিয়া যদি উপরে উঠিতে পারি তাহা হইলে আশ্রয় পাইলেও পাইতে পারি।

অল্পক্ষণ খুঁজিতেই সিঁড়ি বাহির হইল, দেখিলাম বারান্দার চারিকোণে চারিটি পাথরের সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম চারিদিকে চারিটি বারান্দা, বারান্দার পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, কিন্তু কোনটিতেই দরজা জানালা বা কপাট নাই। এঘর ওঘর খুঁজিতে খুঁজিতে আর এক মহলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণটি প্রথমটি অপেক্ষা বৃহৎ, তাহারও চারিদিকে বারান্দা এবং চারিপাশে

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। এক্কাওয়ালা আর চলিতে পারিল না, সে থামের একপাশে বসিয়া পড়িল, আমিও হতাশ হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। এইরূপে কতক্ষণ কাটিল মনে নাই। বৃষ্টি কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ঝড় বাড়িতে ছিল। শীতের তাড়নায় থামের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে বারান্দার এককোণে আসিয়া দেখিলাম যে ত্রিতলে উঠিবার একটি ছোট পাথরের সিঁড়ি আছে, উপরে যেন একটি ক্ষীণ আলোক দেখা যাইতেছে। এক্কাওয়ালাকে আলোকের কথা বলিবামাত্র সে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল প্রাণ যদিও বাঁচিত কিন্তু এখন আর বাঁচিল না, জিনেরা যে আগুনে মানুষ পোড়াইয়া খায় তাহারই আলোক দেখা যাইতেছে। তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে টানিয়া উপরে তুলিলাম।

অট্টালিকাটি এইস্থানে ত্রিতল, সুতরাং বারান্দাও ত্রিতল। সিঁড়ির উপরে একটি ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণ আলোকের রেখা আসিতেছিল। ঘরটি অট্টালিকার অন্যান্য ঘরের ন্যায় প্রকাণ্ড, ইহারও চৌকাঠ ও কপাট প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে পুরাতন কাঠ, ঘাসের বেড়া ও মাটী দিয়া খিলানগুলি বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরাতন কাঠের ছিদ্রপথে যে আলোক বাহির হইতেছিল, আমরা দ্বিতল হইতে তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলাম। এক্কাওয়ালা কিছুতেই এই স্থান হইতে নড়িতে চাহিল না। ভাবিলাম তাহাকে যদি ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে সে পলাইয়া যাইবে এবং অন্ধকারে পথ না পাইয়া হয় ত মরিয়া যাইতে পারে। অগত্যা তাহাকে টানিয়া লইয়া দরজার অনুসন্ধান করিয়া

বেড়াইতে লাগিলাম, দেখিলাম একটি খিলানে ঘাসের বেড়া কাটিয়া ঝাঁপের দরজা তৈয়ারী করা হইয়াছে, কিন্তু দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। অনেক ডাকিলাম, কাহারও উত্তর পাইলাম না। তখন বাধ্য হইয়া ঝাঁপের বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, দুই একবার পদাঘাত করিতেই ঝাঁপ পড়িয়া গেল, আমরা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

দেখিলাম গৃহের এককোণে রজতনির্ম্মিত পাত্রে দুইটি বাতি জ্বলিতেছে। গৃহতলে একখানি অতি প্রাচীন গালিচা বিস্তৃত আছে, তাহা স্থানে স্থানে একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং নিম্নের মসৃণ শ্বেত মর্ম্মর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গৃহে আসবাব বড় অধিক কিছু ছিল না; এককোণে একটি পাথরের মেজ, তাহার উপরে রূপার শামাদান; খিলানগুলিতে মোটা কাপড়ের পর্দ্দা ঝুলান; একটি খিলানের নীচে বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত একটি কাঠের সিন্ধুক এবং তাহার পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র খাটিয়া, তাহাও বোধ হয় চন্দন কি মেহগনিকাষ্ঠে নির্ম্মিত; তাহাতে নীলরঙ্গের রেশমের মশারি ফেলা, দেখিলেই বোধ হয় কে যেন শয়ন করিয়া আছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া দুই তিনবার ডাকিয়া বলিলাম, "গৃহে কে আছ, আমরা পথ হারাইয়া বিপন্ন হইয়াছি ও তোমাদের আশ্রয় লইয়াছি।" কেহই যখন উত্তর দিল না, তখন খাটের নিকটে আসিলাম, মশারি তুলিয়া দেখিলাম পীতবর্ণের রেশমের লেপে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া কে যেন নিদ্রা যাইতেছে। খাটিয়ার নীচে দুইখানি জরির কাজ করা লপেটা পড়িয়া আছে। লেপের উপরে হাত দিয়া দেখিলাম যে, সত্য সত্যই একটি মানুষ শুইয়া আছে। আস্তে আস্তে দুইতিন বার তাহাকে ধাক্কা দিলাম, তাহাতেও যখন সে উঠিল না, তখন একবার

জোরে ধাক্কা দিলাম। তখন সে ব্যক্তি উঠিয়া বসিল, কিন্তু আমি তাহাকে দেখিয়া দুইহাত পিছু হটিয়া গেলাম, এক্কাওয়ালা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

খাটিয়ায় যে ব্যক্তি শুইয়াছিল সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক ; অত্যন্ত কৃশাঙ্গী, শুভ্রবর্ণা এবং অতি বৃদ্ধা। তাহার চুলগুলি শুভ্র হইয়া গিয়াছে, মুখের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, হস্তপদে যেন অস্থির পর চর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। তাহার গায়ে একটি মিহি জাফ্রান রঙ্গের ঢিলা জামা, চুলগুলি তয়ফাওয়ালীদিগের ন্যায় বেণীবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত। তাহার বয়ঃক্রম অনুমান করা কঠিন ; প্রথমে দেখিলে বোধ হয় শতবর্ষের অধিক হইবে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃদ্ধাকে দেখিয়া বোধ হইল, সে বড়ই রূপবতী ছিল। তাহার শীর্ণ মুখমণ্ডলে এককালের ভুবনমোহিনী রূপের ধ্বংসাবশিষ্ট তখনও বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়া আমাকে দেখিল, দেখিয়া একবার চক্ষু রগড়াইল। প্রথম বোধ হয় ভাবিয়াছিল যে স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কোথা হইতে আসিতেছ?" তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ বা ক্ষীণ নহে, মনে হইল অশীতি বৎসর পূর্ব্বে তাহা আরও কোমল, আরও মধুর ছিল। আমি বলিলাম যে আমি পথিক, পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করি। বৃদ্ধা অতি সুন্দর উর্দ্দুতে আমাকে বলিল, "তুমি যৌবনবলদৃপ্ত, তুমি বিদেশীয়, তাই এখানে আসিয়াছ। যৌবনে মরণের ভয় থাকে না। তাহা ছাড়া তুমি এ গৃহের পরিচয় জান না, তাহারই জন্য এ গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। যদি মরণের ভয় রাখ, যদি স্ত্রীপুত্রের মুখ পুনরায় দেখিবার ভরসা রাখ, তাহা হইলে এখনই চলিয়া যাও।" আমি

মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম। বৃদ্ধা আমার মনের ভাব বুঝিয়া পুনরায় কহিল, "ভাবিতেছ, আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক বা এক বেলার খাদ্য দ্রব্য দিতে কুণ্ঠিত? তাহা নহে। যুবক, তোমার এখনও পরমায়ু আছে; যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে ত ফিরিয়া যাও। এ গৃহে আমি ব্যতীত রাত্রিবাস করিয়া কেহ বাঁচিয়া ফিরে নাই। এখনও পলাইয়া প্রাণ বাঁচাও।" আমি বলিলাম "অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে, ফিরিলে পথে মরিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা যদি মরিতে হয় মানুষের কাছেই মরিব।" একাওয়ালা এতক্ষণ বসিয়া ছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "বাবুজি, জানের দরদ কর, এখনও ফিরিয়া চল।" আমি বলিলাম "না।" বৃদ্ধা বলিল, "বহুৎ আচ্ছা, তবে বইস।" এই বলিয়া সে খাট হইতে উঠিল এবং খাটিয়ার নীচে হইতে আর এক খানা গালিচা বাহির করিয়া বিছাইয়া দিল। আমি তাহাতে বসিয়া পড়িলাম। বৃদ্ধা একাওয়ালাকে একখানা কম্বল বাহির করিয়া দিল, সে তাহা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর সে খাটিয়ার তল হইতে একটা বৃহৎ পেটারা বাহির করিল এবং তাহার ভিতর হইতে একখানা রূপার রেকাবী বাহির করিয়া তাহাতে আমার জন্য খাবার সাজাইতে বসিল। রুটী, আঙ্গুর, পেস্তা, কিস্‌মিস ও আখরোট বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। আমি একাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কিছু খাইবে কি না। সে কম্বলের ভিতর হইতেই উত্তর করিল যে ভূতের বাড়ীতে তাহার কিছু খাইবার ইচ্ছা নাই, সে প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিলেই বাঁচে। বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, একে একে খাদ্যদ্রব্যগুলি সমস্তই শেষ করিলাম।

খাটিয়ার পশ্চাতে একটা বৃহৎ ফরাশি-দেশীয় পুরাতন ঘড়ি ছিল, তাহাতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল। বৃদ্ধা সতর্ক হইয়া উঠিয়া বসিল এবং দুই হাত দিয়া আমার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি আহার শেষ হইলে দরজার ঝাঁপটা পুনরায় বাঁধিয়া দিয়াছিলাম।

এই সময় অট্টালিকায় উচ্চ-বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম, তাহার পর মনে হইল বারান্দায় অনেক লোক চলিতেছে, একজন আসিয়া উপরে ও নীচে অনেক আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল। নীচে অনেক লোকের কথা শোনা যাইতে লাগিল। কোনও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বোধ হইল যেন বিশেষ কোন সমারোহ ব্যাপার উপস্থিত। পরিচারকেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, একজন পরুষকণ্ঠে তাহাদিগকে আদেশ করিতেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে গোলমাল থামিয়া গেল। তাহার পর বোধ হইল নিম্নতল হইতে চারিদিকের সিঁড়ি দিয়া অনেক লোক উপরে উঠিতেছে, উপরে অন্যান্য লোকেরা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতেছে। একবার ভাবিলাম স্বপ্ন দেখিতেছি। চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলাম, বৃদ্ধা আমার গা টিপিয়া আমাকে উঠিতে নিষেধ করিল।

বাহিরে বোধ হয় তখনও ঝড় থামে নাই। হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস আসাতে ঝাঁপের দরজা পড়িয়া গেল, বাতাসে আলোক নিবিয়া গেল, তখন আমার মনে একটু ভয় হইল। মনে হইল যেন কয়েকজন লোক উপরে আসিতেছে। সত্যসত্যই চারিজন লোক ঘরে প্রবেশ করিল, তাহাদিগের একজনের হাতে একটা লণ্ঠন, তাহার ভিতরে একটা

নীল আলো জ্বলিতেছিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহারা একখানা বড় চাদর বিছাইল, তাহার উপরে একখানা গালিচা পাতিল, আর একজন একটা ছোট সেজ আনিয়া গালিচার মাঝখানে রাখিল। তাহার পরে আরও কয়েকজন লোক আসিয়া গালিচার উপরে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া দিয়া গেল। দুইজন মনুষ্য প্রবেশ করিয়া আহার করিতে বসিল, তাহাদিগের আকার দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান বলিয়া বোধ হইল। তাহারা ধীরে ধীরে আহার করিতে করিতে নানা কথা কহিতেছিল, কিন্তু আমি নিকটে থাকিয়াও কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না, কেবল কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নীরবে বসিয়া রহিলাম, আর বৃদ্ধা বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত ধরিয়া পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল। তাহাদিগের আহার শেষ হইয়া গেল, তাহারা চলিয়া গেল, পরিচারকেরা আসিয়া পাত্র, গালিচা ও দস্তরখান উঠাইয়া লইল। এমন সময় কে ঘরের মধ্যে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম একাওয়ালা দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, দারুণ ভয়ে তাহার চক্ষুদ্বয় যেন কোটর হইতে নির্গত হইয়া পড়িতেছে, তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল সে খুব ভয় পাইয়াছে। আলোকগুলি হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকার ঘরে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ শুনিতে পাইলাম, বুঝিলাম একাওয়ালা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, উঠিতে যাইতেছিলাম, বৃদ্ধা গা টিপিয়া নিষেধ করিল।

নীচে তখনও গোলমাল হইতেছিল, কিন্তু ক্রমে তাহা থামিয়া আসিল; মনে হইল কে যেন এস্রাজের সহিত সারেঙ্গীর সুর মিলাইতেছে। তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া সুর মিলাইতে লাগিল; প্রথমে সুর মিলিল না, অনেকক্ষণ পরে মিলিল, তাহার পর সারেঙ্গী ও এস্রাজ একত্র মিলিয়া

বাজিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত নূপুরনিক্কণ শোনা যাইতেছিল। স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, বাদ্যের সহিত তালে তালে কে যেন নৃত্য করিতেছে। তাহার পর এস্‌রাজ ও সারেঙ্গীর ধ্বনি ডুবাইয়া বামাকণ্ঠস্বর উত্থিত হইল। যে গাহিতেছিল তাহার ক্ষমতা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব, এমন মধুর কণ্ঠস্বর আর শুনি নাই। গান শেষ হইল, শত শত কণ্ঠ প্রশংসা-সূচক শব্দ করিয়া উঠিল। তাহার পর আবার সারেঙ্গী বাজিয়া উঠিল, গায়িকা পুনরায় গাহিতে আরম্ভ করিল। ঘড়িতে একটা বাজিল।

দুই তিনখানা গান শেষ হইল, গায়িকা যখন চতুর্থ গান আরম্ভ করিয়াছে তখন নিম্নতলের প্রাঙ্গণে পাল্কীর বেহারার গলার আওয়াজ পাইলাম ; মনে হইল যেন একখানি পাল্কী দ্রুতবেগে উপরে আসিতেছে। অকস্মাৎ গীতবাদ্য থামিয়া গেল। তাহার পর কে যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল, শত শত লোকে তাহার সহিত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার পর সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। যেন বহুলোক ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের সহিত অনেক লোক সোপান বাহিয়া দ্বিতলে আসিল। তাহার পর অনেকক্ষণ কোন শব্দ পাইলাম না। কে যেন কাঁদিতে আরম্ভ করিল, বোধ হইল বামাকণ্ঠ। সমস্ত আশা-ভরসা, শেষ হইয়া গেলে স্ত্রীলোকে যেমন ভাবে কাঁদিয়া থাকে, যেমন ভাবে পুরুষে কাঁদিতে পারে না, বুকের পঞ্জরগুলি ভাঙ্গিয়া হৃৎপিণ্ড ছিনাইয়া লইলে রমণীতে যে ভাবে কাঁদিয়া থাকে, সেই ভাবের শব্দ আসিতেছিল। কি কারণে জানি না আমার মনে হইল গায়িকাই যেন কাঁদিতেছে। তাহার পর অন্য লোকে যেন কাহার দেহ লইয়া বারান্দায় আনিয়া ফেলিল, জল ঢালিয়া ধোয়াইল, তাহার পর "লা

ইলাহা ইল্লাল্লা” উচ্চারণ করিতে করিতে নীচে লইয়া গেল ও প্রাঙ্গণ পার হইয়া চলিয়া গেল। রমণী তখনও কাঁদিতেছিল, গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিতেছিল, দেখিতে দেখিতে আলোকমালা নিবিয়া গেল, রমণী তখনও কাঁদিতেছিল। দারুণ যন্ত্রণায় কে যেন আবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম গালিচার উপরে শুইয়া আছি, ঘাসের বেড়ার ফাঁক দিয়া গৃহে রৌদ্র প্রবেশ করিতেছে। বৃদ্ধা বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছে, একাওয়ালা তাহার পাশে বসিয়া আছে। বৃদ্ধা অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ একজন পরিচারক কক্ষ পরিষ্কার করিতেছে। উঠিয়া প্রশ্নের উপরে প্রশ্ন করিয়া বৃদ্ধাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলাম। বুড়ী হাসিল, বলিল “তুমি আহার না করিলে কোন কথার উত্তর দিব না।” কোন মতেই তাহাকে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিতে পারিলাম না, অগত্যা বাধ্য হইয়া স্নান ও আহার করিলাম। বুড়ি আলবোলা লইয়া খাটিয়ার উপরে বসিল। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে যেরূপ উর্দ্দূ প্রচলিত সেই ভাষায় বৃদ্ধা আমাকে যে কাহিনী বলিল তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। বৃদ্ধা বলিল—

“বাবুজি, আমি জাতিতে নর্ত্তকী। পূর্ব্বে হিন্দু ছিলাম, এখন মুসলমানী হইয়াছি। দিল্লী, লাহোর, গোয়ালিয়র ও লক্ষ্ণৌতে রাজদরবারে নৃত্য করিতাম। বাবুজি, দ্বিতীয় আকবরের নাম শুনিয়াছ? যে হতভাগ্য বাদশাহ সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল, আক্‌বর তাহারই পিতা। ষাট বৎসর পূর্ব্বে দিল্লী ও লাহোরের লোকে আমার নাম শুনিলে পাগল হইত। তওয়াইফ মহলে আমার বড় সুখ্যাতি ছিল। লাহোরে শিখ বাদশাহের দরবারে, গোয়ালিয়রে মহারাজ সিন্ধিয়ার

দরবারে আমার প্রায়ই তলব পড়িত। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে আমার তন্‌খা বাঁধা ছিল। কোম্পানী বাহাদুর আসিয়া যখন অন্ধ বাদশাহ শাহ আলমকে মারাঠার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিল, তাহার তিন বৎসর পরেই বাদশাহের মৃত্যু হয়। আকবর বাদশাহ হইলে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম আলি মাসে দশহাজার টাকা বৃত্তি পাইতেন। শাহজাদা বড়ই নৃত্যগীতপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার মজলিসে আমার প্রায়ই মজুরা করিতে যাইতে হইত। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিল, তাহার পর আমি মজিলাম!

"বাবুজি আমি জাতিতে হিন্দু সুতরাং শাহজাদা ভরসা করিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে আমি বড়ই সুন্দরী ছিলাম, সে কথা তুমি এখন বিশ্বাস না করিলেও করিতে পার। তখন নবাব ও শাহজাদারা আমার জন্য পাগল হইয়া বেড়াইত। আমি কখনও কাহাকে অনুগ্রহ করি নাই, কিন্তু গোলাম আলির রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া নিজেই মজিলাম,—মুসলমানী হইলাম। গৃহত্যাগ করিয়া মহলে প্রবেশ করিলাম, শাহজাদা আমাকে বিবাহ করিলেন,—আমি তাঁহার উপপত্নী হই নাই। সম্রাট আকবরশাহ তখন কোম্পানী বাহাদুরের আশ্রিত, কিন্তু তখনও দিল্লীতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি বিবাহের কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ইহার অন্য কারণও ছিল। শাহজাদা গোলাম আলি সম্রাটের প্রধানা মহিষীর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্যালিকার প্ররোচনায় আকবর শাহ আমাদিগের বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শাহজাদা বাধ্য হইয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন, অবশ্য আমাদিগকে লইয়া।

"এই যে অট্টালিকা দেখিতেছ ইহা মালবের প্রাচীন বাদশাহদিগের

নির্ম্মিত। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শাহজাদা এই বনমধ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পিশাচী মোগলকন্যা দিল্লীতে থাকিতে পারিল না, সলিমাবাদে আসিল, শাহজাদা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলেন। এখানে আসিয়া পিশাচী প্রাণ খুলিয়া আনন্দের সহিত মিশিল, শাহজাদাও তাহার পূর্ব্ব-বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এখানে বড়ই সুখে বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া শাহজাদা দিল্লীর বিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

"বাবুজি, শাহজাদা আমার গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার আহ্বানে মালবের অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত গায়িকা ও নর্ত্তকী এই প্রাসাদে মজুরা করিতে আসিত বটে, কিন্তু কাহারও গান তাঁহার পছন্দ হইত না। বিবাহ হইবার পরে প্রতিদিন অন্দরমহলে মজলিস বসিত। সদর-মহলে প্রথম রাত্রিতে একদফা মজলিস বসিত, দুই একজন বিশেষ বন্ধু লইয়া শাহজাদা নিশীথ রাত্রিতে অন্দরমহলে আসিতেন। বাবুজি, তাঁহার আদেশে আমি তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতাম; গানে ও নাচে রজনীর অধিকাংশ অতিবাহিত হইত। একদিন আমার কপাল ভাঙ্গিল। পিশাচী সেদিন অসুখের ভাণ করিয়া আমাদিগের সহিত মিশিল না। যথাসময়ে অন্দরমহলে মজলিস বসিল, দুই তিন খানা গান গাহিবার পর পিশাচী কোথা হইতে ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া শাহজাদার বুকে একখানা ছোরা বসাইয়া দিল। তাঁহাকে পাল্কী করিয়া অন্য মহল হইতে আসিতে দেখিয়া পরিচারকেরা ভাবিয়াছিল যে বেগম অন্যদিনের ন্যায় মজলিসে যোগ দিতে আসিয়াছেন। শাহজাদাকে হত্যা করিয়া পিশাচী নিজে আত্মহত্যা করিল। সব শেষ হইয়া গেল। হকিম আসিল, পরীক্ষা করিয়া বলিল "ছুরিকা বিষাক্ত, মরণের অধিক বিলম্ব নাই।" শাহজাদাও তাহা বুঝিতে

পারিতেছিলেন। আমার কোলে মাথা রাখিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" সেই রাত্রিতেই পরিচারকগণ প্রাঙ্গণে তাঁহাদের মৃতদেহ কবর দিল।

"তাহার পর একে একে বন্ধুবান্ধব, পরিচারক-পরিচারিকা সকলেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। শাহজাদার মৃত্যুর সহিত সরকারের তন্‌খা বন্ধ হইয়া গেল। ক্রমে প্রাসাদ বনে ভরিয়া গেল। বাবুজি, এই বিশাল পুরী সুসজ্জিত করিয়া রাখা আমার সাধ্যাতীত। তাহার পর হইতে প্রতিদিন রাত্রিতে এই স্থানে সেই হত্যা-কাণ্ডের অভিনয় হইয়া থাকে। তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ সত্য, স্বপ্ন বা মিথ্যা নহে। অতৃপ্ত প্রেতাত্মাগুলি জীবনের শেষ রজনীর ঘটনা এখনও প্রতিদিন অভিনয় করিয়া থাকে। সেই ভয়ে মানুষ এ পথে আসে না। কেবল আব্দুল্লা আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, সে ছিল বলিয়াই এতদিন বাঁচিয়া আছি, তাহারই সাহায্যে এই বিশাল প্রাসাদের এককোণে এতকাল বাস করিতেছি। শয়তান ও জিনের আবাস বলিয়া এই দেশের লোকে কেহ এই স্থানের নিকটেও আসেনা। এই স্থানের দশক্রোশের মধ্যে লোকালয় নাই। যাহারা ছিল তাহারা সকলে মরিয়া গিয়াছে বলিয়া ভয়ে নূতন লোক বাস করিতে আসেনা। প্রাসাদের চারিদিক অরণ্যসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে।

"আমি যাই নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি যে তাঁহার গৃহে বাস করিতেছি। ইহার প্রত্যেক পাষাণ-খণ্ড আমার হৃৎপিণ্ডের ন্যায় প্রিয়। বাবুজি, শাহজাদা গোলাম আলিকে কেহ কখনও মিথ্যা বলিতে শুনে নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন আবার আসিবেন, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন; আমি তাঁহার **প্রতীক্ষায়** রহিয়াছি।"

অভাগিনী।

মাঘের শেষে প্রভাতের ঘন কুয়াসায় কাহার একটি ছোট মেয়ে আমার বাগানে গাঁদাফুল তুলিতে আসিয়াছিল। সেদিন আফিমের মাত্রাটা একটু বেশী হইয়া যাওয়ায় রাত্রিতে মোটেই ঘুম হয় নাই, তাই হুঁকাটা হাতে করিয়া টুলখানা লইয়া বারান্দায় বসিয়া ছিলাম। আমার বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে আমি সাজি-হাতে ছোট মেয়েটীকে দেখিয়া হরের মা গোয়ালিনীকে মনে করিব কেন, আর ফুল কুড়াইতে দেখিয়া সে আমার বুধি গরুর গোবর চুরী করিতেছে তাহাই বা ভাবিব কেন? বস্তুতঃ আমার টুলের উপর বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ কলিকাটি না পড়িয়া গেলে মেয়েটীকে দেখিতে পাইতাম না। হরের মা নিত্য আমার বাড়ী হইতে গোবর চুরী করিয়া লইয়া যায়, আমি তাহাকে ধরিতে পারি না, তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আজ তাহাকে ধরিবই ধরিব। তাহাকে দেখিয়াই খালি পায়ে হুঙ্কার করিতে করিতে আমি একেবারে বেলতলায় গিয়া উপস্থিত। সে আমাকে দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সে পলাইল না দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, তখন বুঝিলাম সে হরের মা নহে,

কারণ সে আমাকে দেখিলেই দ্রুতচম্পট দিয়া থাকে,—অবশ্য গোবরের ঝুড়িসমেত। মেয়েটি অনিন্দ্যসুন্দরী, একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া মুখখানি হেঁট করিয়া সাজি হাতে গাঁদা গাছের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সে কে এবং তাহার নাম কি। উত্তরে জানিলাম সে গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টারের কন্যা এবং তাহার নাম কমলা, মাতার পূজার জন্য ফুল তুলিতে আসিয়াছে। তখন আমার মনে বড় লজ্জা হইল। আমি তাকে অভয় দিয়া বারান্দায় ফিরিয়া আসিলাম। এক ছিলিম তামাক সাজিয়া যেমন টুলে বসিয়াছি অমনি হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া গেল, চক্ষু মেলিয়া দেখি বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে, হরের মা বহু পূর্ব্বে বেলতলা হইতে গোবরটুকু সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। তাহার উপর রাগ বাড়িয়া গেল, কারণ তাহাকে ধরিতে ত পারিলামই না; আবার পাঁচ সিকা দামের হুঁকাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

হরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের গ্রামের পোষ্টমাষ্টার, অতি সদাশয় ভদ্রলোক। তিনি এক বৎসর যাবৎ পরিবার লইয়া আমাদিগের গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে স্ত্রী, বিধবা ভগ্নী, কন্যা কমলা এবং শিশুপুত্র। তাঁহার গুণে গ্রামবাসিগণ মুগ্ধ এবং সকলেই কোন না কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু, প্রত্যহ পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শ্রাদ্ধশান্তি নিয়মিত করা আছে, যথাসাধ্য ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া থাকেন। মোটের উপর লোকটা মন্দ নহে কিন্তু একটি দোষে লোকটা একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে; বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে এক ছিলিম তামাক অবধি পাইবার যো নাই।

২

দেশে আর খাঁটি দুধ মিলিবার উপায় নাই, গয়লা বেটারা সব কলিকাতায় চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁড়ুয্যে সেদিন খুব ঘটা ক'রে মেয়েটার বিয়ে দিলে, তা বাজারে একটু ভাল ক্ষীর আর খুঁজে পেলে না। পাইবার যো কি? গয়লা বেটাদের জ্বালায় বালি-এরারুট এমন কি পুকুরের জলের দরও চড়িয়া গিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছিল, সেই জন্য এবং মিষ্টিটা ক্ষীরটা কি রকম উতরাইল তাহা পরখ করিয়া দেখিবার জন্য একবার গিয়াছিলাম মাত্র। তা গয়লা বেটাদের জ্বালায় দই ক্ষীর ছানা কিছু কি আর মুখে করিবার যো আছে? বাঁড়ুয্যে মেয়েটার বিয়ে দিলে বটে, কিন্তু লোকে বলিল মেয়েটাকে সমুদ্রে দিল। কায়স্থপাড়ার গিরিশ বসু দুর্জ্জয় মাতাল, সে বিবাহের রাত্রে বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়া বসিল, "দাদাঠাকুর মেয়েটাকে জলেত ফেল্লেই, তার আর কোন কথা নাই, কিন্তু এ যে বাবা অতলস্পর্শ, একটা শব্দও হ'ল না।" গ্রামের লোকে হাসিয়া উঠিল, বাঁড়ুয্যে বেচারী কি করে, তাহাদিগের সঙ্গে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া উঠিল। বরের একটু বয়স বেশী বটে, তবে এমন কিছু বেশী নয়; আমাদের বয়সে অনেক বেশী বুড়ার বিবাহ দেখিয়াছি। তা আমার ত আর কোন কথা বলিবার যো নাই। বরের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, দু'এক গাছা চুল পাকিয়াছে মাত্র, গালে ঈষৎ টোল খাইয়াছে; তাহা আবার সব সময়ে বুঝা যায় না, সুতরাং দুএকটা দাঁতও পড়িয়াছে। ছোঁড়াগুলা বলিল, "বরের বয়স ৭০।৭২"। রং এমন কি কালো, আমার বয়সে আমি ঢের বেশী কালো দেখিয়াছি, কিন্তু

তাহা কি আমার বলিবার যো আছে, তাহা হইলে ছোঁড়ার দল অমনি ক্ষেপিয়া উঠিবে আর গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া দিবে যে, হারুখুড়ার আফিমের নেশা ছাড়িয়া বিবাহের নেশা ধরিয়াছে; আমার যে আর ছাড়িবার উপায় নাই, তা কি ছোঁড়া বুড়া কোন বেটা বুঝে? আর আমি এমনই পাগল হইয়াছি যে, দক্ষিণ দিকে পা করিয়া বিবাহের জন্য পাগল হইব? বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বিবাহের কথা বলিতে গিয়া কত আপদ্ বালাই আসিয়া জুটিল। বন্দ্যোপাধ্যায়-জামাতা যখন পিঁড়ির উপরে এবং উঠানে তাহার সাড়ে তিন মণ বপুখানি ছড়াইয়া মন্ত্র বলিবার নাম করিয়া হাঁপাইতেছিল, তখন মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল, আর মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সে কম্পনের অনেক লোকে অনেক ব্যাখ্যা করিল, নবীন দল বলিল, "মেয়েটি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে," প্রবীণের দল বলিল, "মহিষের ভয়ে কাঁপিতেছে," মাঝ থেকে গিরিশ বসু বলিয়া উঠিল, "বাবাজী আমার মনে কচ্ছেন যে, কনে আনন্দে শিউরে উঠ্‌ছে।" বর-বেচারা আর কি করে একবার আকর্ণবিশ্রান্ত দশনপঙ্‌ক্তি বিকাশ করিয়া হাসিল। মন্ত্রদানের পর বর উঠিয়া গেল, তখন জামাতার রূপ দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহিণী কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাঁহার দেখাদেখি অন্দরে আর যে যেখানে ছিল এক একবার সুর ধরিল; আমার মৌতাতটা নষ্ট হয় দেখিয়া একটা হুঁকা লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলাম। তখন বেগতিক দেখিয়া বাদ্যকরেরা ঢোল সানাই লইয়া সরিবার উপক্রম করিতেছিল।

যাক্, বিবাহটা তো চুকিয়া গেল। বরভায়া ক্ষীণ তনুখানি বহুকষ্টে পাস্কাজাত করিয়া ফুলশয্যার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। ষোল জন

বেহারা প্রাণপণ শক্তিতে বহিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না; তখন আমি ছেঁচা পানটুকু মুখে করিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছি মাত্র। বাঁড়ুয্যে বাড়ী তখন মড়াকান্না উঠিয়াছে, সে আওয়াজ সানাইয়ের সহিত মিশিয়া মন্দ লাগিতেছিল না।

৩

এই পাঁচ বেটার জ্বালায় দেশে কি বাস করিবার যো আছে, না কোন কথা বলিবার উপায় আছে। বাঁড়ুয্যের জামাই মরিল তা ফেলিতে যাইবার লোক আর দেশে পাইল না, গ্রামের মধ্যে ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা আছে হারুখুড়া, ডাক্ তাহাকে। আমার এখন তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, গঙ্গা-মুখে পা বাড়াইয়াছি, আমার কি ছাই অত মনে থাকে? আমার অপরাধের মধ্যে আমি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম যে, "আমার গৃহিণী অন্তঃসত্ত্বা।" গৃহিণী যে আজ বিশ বৎসর আমায় ছাড়িয়া গিয়াছেন তাহা কি আমার মনে ছিল? তাই পাঁচ বেটায় হাসিয়া আমায় মাটি করিয়া দিল, গৃহিণীর দারুণ শোক যে বজ্রের মত আমার বুকে বাজিল, তাহা কি কেহ বুঝিল? আমি রাগে লজ্জায় ঘৃণায় কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেলাম। বাঁড়ুয্যের জামাই বেটার কি আক্কেল, সে বেটা এত দেশ থাকিতে শ্বশুরবাড়ী ভিন্ন মরিবার জায়গা পাইল না। আমার আবার বলিতে কি জান, একটু বয়সটা অধিক হয়েছে কিনা? উপদেবতার নাম করিলে গা-টা যেন কেমন করিয়া উঠে। আমি আর সেদিন ঘরের বাহির হইতে পারি নাই। সন্ধ্যা অবধি রাম-নাম লিখিয়াছি, পুরাতন রামকবচের মাদুলিটি নতুন সূতায় বাঁধিয়া হাতে পরিয়াছি, অবশেষে অন্ধকার হইয়া আসিলে, যখন গ্রামের যণ্ডাগুলা বাঁশের

মাচায় করিয়া হরিবোল দিতে দিতে জামাইটাকে ঘাটে লইয়া গেল, তখন হাঁফ ছাড়িয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। জামাইটা অনেক দিন ধরিয়া বহুমূত্রের পীড়ায় ভুগিতেছিল, নানা স্থানে চিকিৎসা করিয়াও যখন সারিল না, তখন শ্বশুর বাড়ী উপস্থিত হইল, বলিল, "গ্রামের ধরণী কবিরাজের চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছি।" ধরণী কবিরাজের চিকিৎসা হইতে না হইতে জামাইটা ত মরিল, মরিয়াও আমায় একটা অখ্যাতি দিয়া গেল। সেইদিন রাত্রিতে গ্রামের লোক যখন দাহ করিয়া ফিরিল, তখন পাড়ার সকলে কমলাকে নদীতে লইয়া গেল, তাহার ক্ষীণ রোদনধ্বনি এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে।

৪

মেয়েটা বিধবা হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় বড় আঘাত পাইল, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে সেও জামাতার অনুসরণ করিল; তখন শিশুপুত্র ও বিধবা কন্যা লইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-গৃহিণী দেশে ফিরিয়া গেল। আমাদের গ্রামে ক্রমে লোকে বাঁড়ুয্যের নাম ভুলিয়া গেল। আমার দিন আর কাটে না, বিষম বিপদ্ উপস্থিত, শুনিলাম সরকার হইতে নাকি আফিমের চাষ তুলিয়া দিবে। গিরিশ বসুর ছেলেটা কলিকাতায় ইংরাজী পড়িয়া একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে, সে বেটা এল, এ—না—বি, এ কি ছাই পাস করিয়া আসিয়া গ্রামখানাকে যেন কিনিয়া ফেলিয়াছে। গ্রামে আর তিষ্ঠাবার যো নাই, দিন রাতই সভাসমিতি, হট্টগোল, গোলযোগ। ষষ্ঠীতলায় একখানা নূতন চালা বাঁধিয়াছে; প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের যত ব্যাটা একত্র হইয়া নরক গুলজার করে। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে গাঙ্গুলিপাড়া হইতে ফিরিতেছি, এমন সময় পাষণ্ডগুলা আমাকে ধরিয়া

বসিল। আমার প্রাণ যায় আর কি? এক বেটা বলিল, "ঠাকুরদা কি ঠান্‌দি খুঁজতে বেরিয়েছ?" আর এক দল বলিল, "ঠাকুরদা, এবার কালাচাঁদ ছেড়ে গাঁজা ধর, তোমার কালাচাঁদের এবার গঙ্গাযাত্রা—শুনেছ ত?" আমার চোক ফাটিয়া জল আসিল, মনে মনে ভাবিলাম গঙ্গাযাত্রার পূর্ব্বে যেন বিশ্বনাথ আমায় দয়া করেন। এমন সময়ে গিরিশ বসুর কুষ্মাণ্ডটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া পাষণ্ডের দল সরিয়া দাঁড়াইল। সে যত্নের সহিত আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইল, এক ছিলিম তামাক খাওয়াইল, আমার মনটা একটু নরম হইয়া আসিল। ও মহাশয়! বেটা বলে কি? বলে আফিম খাওয়া ছাড়, আফিমে লোকের সর্ব্বনাশ হয়, আফিম খাইয়া চীনেরা মরিয়া আছে। তখন আমি রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছি, হাত হইতে হুঁকাটা পড়িয়া গিয়াছে, বেটার কিন্তু তখনও ন্যাকামি, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তখনও আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বলিয়া ফেলিলাম "তুই জানিস্ যে, আমার অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় আফিম প্রবেশ করিয়াছে!" আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, হন হন করিয়া একটানে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

গিরিশ বসু নির্ব্বংশ হইল না, কিন্তু সত্য সত্যই আফিমের দর চড়িতে লাগিল। ঘোর কলি, সবাই বুঝিল কোম্পানী বাহাদুরের মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে, নতুবা দেশে এত জিনিষ থাকিতে আফিমের চাষ তুলিবার বুদ্ধি যোগাইবে কেন? জীবন রায়ের খুড়া বহুকাল অবধি কাশীবাস করিতেছে, বিশ বৎসরের পরে বুড়া দেশে আসিয়া আমার কর্ণে মন্ত্র দিয়া গেল; বলিয়া গেল যে, কাশীবাস ভিন্ন আমার আর গতি নাই। জীবন রায়ের

খুড়া কাশী চলিয়া গেল ; গেলত গেল,—আমার মনটা কিন্তু হরণ করিয়া লইয়া গেল। সাত পাঁচ ভাবিয়া কাশীযাত্রা করাই স্থির করিলাম। দেশের বিষয়ের অংশটি জ্ঞাতিরা ভোগ করিবে, তাহা আমার অসহ্য বোধ হইল। বিষয়-আশয়, তৈজসপত্র অবশেষে ভদ্রাসনখানি বিক্রয় করিয়া কাশীযাত্রা করিলাম। এখন আর বলিতে দোষ কি ? সত্তর বৎসর পরে জন্মভূমির মায়া কাটাইলাম ; দেশ ছাড়িতে বড় বিশেষ কষ্ট হয় নাই, কারণ জীবন রায়ের খুড়া বলিয়া গিয়াছিল যে, কাশীতে আফিম বড় সস্তা।

৫

বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বড় সুন্দর স্থান। যাহারা বুড়া বয়সে কাশীবাস করিতে আসে তাহারা বড় সুখেই থাকে। এখানে আসিয়া বড় আনন্দেই দিন কাটিতেছে। দুধ, ঘি, মালাই, রাবড়ী, এমন কি আফিম পর্য্যন্ত জলের দর। বাঙ্গালীটোলায় এক গৃহস্থের বাটীতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়াছি; বাড়ীওয়ালারা চারি সহোদর, চারিজনেই বিবাহিত, তাহাদিগের সংসারে গৃহিণী নাই। অপর পরিবারের মধ্যে এক বিমাতা, তাহার বয়স বড়বধূর সমান। বুড়া বলিয়া তাহারা আমাকে পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে বড় এবং মেজ-বৌ একটু বয়ঃস্থা, সুতরাং মুখ ফুটিয়াছে, সেজ এবং ছোট তখনও বালিকা। সংসারে বড় এবং মেজ-বৌ কর্ত্রী, বিধবা শাশুড়ী পাচিকা, এমন কি দাসী বলিলেও চলে। ব্রাহ্মণকন্যা একা সংসারের সমস্ত কাজ করিত। নীরবে বউ দুইটির শাসন সহ্য করিত এবং দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। আমাকে দেখিয়া দিনকতক সে সম্ভ্রম করিয়াছিল, ক্রমে মাথার কাপড় সরিয়া গেল, মুখ ফুটিল, স্বর সপ্তমে উঠিল, ক্রমে অসহ্য হইয়া

উঠিল। মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া হুঁকাটি হাতে লইয়া বারান্দায় বসিয়া আছি, হঠাৎ নীচে হইতে একটু জোর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। শুনিলাম বড়-বৌ বলিতেছে, "মরণ আর কি, ব'ল্‌তে একটু লজ্জা হয় না, তোমার জন্য আতপ চালের কাঁড়ি কত যোগাবো? অতি বিনীতভাবে শাশুড়ী উত্তর করিল, "আতপ চাল কালই ফুরিয়েছে, তাত তখনই তোমাকে বলেছি বউমা। বড় ছেলের সম্মুখে কোন কথা বলিতে আমার বড় লজ্জা করে, তাই তোমাদের বিরক্ত করি।"

"লজ্জাবতী লতা আর কি? যখন নিজের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি আনাজ কুটে নিয়ে যস্তি কর্‌তে বসেন, তখন লজ্জা থাকে কোথায়? আমার বল্লেই কি ফুরিয়ে গেল? আমার এত কি গরজ যে, তোমার চালের কথাটি মুখস্থ করে রাখ্‌ব?"

শাশুড়ী অতি কাতরভাবে বলিল, "আমি ত সকাল বেলাই তোমায় একবার মনে করে দিয়েছিলুম, তা তুমি বল্লে, "হাঁ তা হবে এখন।" আমি তোমাদের খাওয়া দাওয়া হ'লে নিজের ঝালের ঝোল চড়িয়ে দিয়ে চাল আনতে গিয়েছিলুম; তা জালায় হাত দিয়ে দেখি যে, একটি কুটাও নাই।"

মেজ-বৌ আঁচল পাতিয়া নীচের বারান্দায় শুইয়াছিল, শাশুড়ীর কথা শেষ হইবা মাত্র মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ বাছা, খেটে খুটে তোমার জন্য একটু আরাম করবার যো নাই; একদিন আতপ চাল ফুরিয়েছে, সিদ্ধ চাল খেলেই পার! এত বেলায় কে আর তোমার জন্য চাল্‌ আন্‌তে যাচ্ছে বল? তোমার অত পটপটানি কেন? যা রয় সয় তাই ভাল।" ব্রাহ্মণকন্যা আর কোন কথা না বলিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ

করিল ; তাহার পরেই আগুনে জল ঢালার শব্দ উঠিল ; মেজ-বৌ পাশ ফিরিয়া শুইল, বড়-বৌ চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতে লাগিল। আমার চমক ভাঙ্গিল, দেখিলাম কলিকাটি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিলাম, তামাকটি টানিতে টানিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উপরে ডাকিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমিও ত এই বাড়ীতেই থাকি, ব্রাহ্মণকন্যা যদি উপবাসী থাকে আমার অকল্যাণ হইবে। তিনি উপরে আসিলে তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হারু দাদা, তুমি কি আমায় চিন্‌তে পারছ না? আমি যে হরি বাঁড়ুযোর মেয়ে কমলা।" সেই অনশনক্লিষ্টা, রূপলাবণ্যহীনা বিধবামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মনে করিলাম আমিও একবার কাঁদি ; কিন্তু হৃদয় শুষ্ক, নীরস মরুভূমির মত, চক্ষু তীব্র কঠোর, তাহাতে অশ্রুবিন্দুর স্থান নাই।

বিশ্বনাথ কাশীতে সব করিয়াছেন, কেবল কৈলাসের খানিকটা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কাশীধামে বড়ই গ্রীষ্ম, যেমন বিপরীত মশা, তেমনই মাছির উপদ্রব। কালাচাঁদের মহিমায় ঘুমত কখনই হয় না, তাহার উপর ঠিক ঘুমের সময়টীতে কাশীর যত লোকের অদৃষ্টে আগুন লাগিবে। শেষ রাত্রিতে একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার উপায় নাই, সেই সময় মাগী মর্দ্দ যাত্রায় বাহির হইবে। বিরক্ত হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে উঁচু চাতালটীর উপর বসিয়া আছি। শত শত লোক আসিতেছে, স্নান করিতেছে, ফিরিয়া যাইতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া তাহাই দেখিতেছি, এমন সময় ঘাটে এক মাগি আমাকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিয়া, ডাকিল "বাবু—বাবু!"

আমি বলিলাম, "কি ?"

"গিন্নীরা আপনাকে আজই বাড়ী ছাড়তে বলেছেন।"

ব্যাপারখানা কি তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। আমি কমলার পরিচিত, একথা লক্ষ্মীরা জানিতে পারিয়াছেন, তাই আমার উপর এই আদেশ।

মনে করিলাম, কমলাকে লইয়া কোথাও যাই, কিন্তু লোকে বলিবে—'তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?' সত্যই ত, আমার কি ? আমি পরের বোঝা মাথায় করি কেন ?

কাছের দোকান হইতে এক ভরি আফিম কিনিয়া আমি সেই দিনই বাসা ছাড়িয়া দিলাম।

আহ্বান।

(১)

ইন্দু বালবিধবা। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের কথা, স্বামীর কথা, তাহার বড় একটা মনে ছিলনা। কেবল মাত্র মনে পড়িত শুভদৃষ্টির কথা, দুইজনে তাহাকে পিঁড়িতে বসাইয়া উচ্চে উঠাইতেছে, সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে প্রাণপণ শক্তিতে পিঁড়ি চাপিয়া ধরিয়াছে। তাহার পর কে একখানা কাপড় আনিয়া তাহার মাথার উপরে ফেলিয়া দিল, সকলে তাহাকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে বলিল, সে দুইতিনবার চেষ্টা করিয়াও চাহিতে পারিলনা। তিরস্কৃত হইয়া বহুকষ্টে সে একবার চক্ষু মেলিয়াছিল, তাহাও সত্য সত্যই নিমেষের জন্য। লজ্জা আসিয়া পল্লবে ভর করিল, আঁখি আপনা হইতে মুদিয়া আসিল, যাহারা তাহাকে ধরিয়াছিল তাহারা ক্লান্ত হইয়া পিঁড়ি নামাইয়া ফেলিল, বামা-কণ্ঠ-উত্থিত মঙ্গলধ্বনি তাহার পিতৃগৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই নিমেষে সে যাহা দেখিয়াছিল তাহাই তাহার মনে পড়িত, ইন্দু বিবাহের অপর সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে দেখিয়াছিল নীলেন্দীবরতুল্য দুটি নয়ন সাগ্রহে তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে, আর দেখিয়াছিল যে কন্দর্পের শরাসনতুল্য যুগ্ম ভ্রূর উপরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দনবিন্দু শুভ্রললাট রঞ্জিত করিয়াছে।

ইন্দু মেয়েটি বড় শান্ত। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে সে অনেক সহ্য করিতে শিখিয়াছিল। সে জানিত যে তাহার অলঙ্কার পরিতে নাই, সজ্জিত হইতে নাই, সমবয়স্কাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিতে নাই, আর, কেন নাই, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে নাই। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে, জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মাতা ও পিতামহী অধীরা হইয়া পড়েন, পিতা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠেন, ভ্রাতারা নীরবে নতমস্তকে চলিয়া যায়। তাহার সই বনমালা তাহা অপেক্ষা দু'এক বৎসরের বড়। তাহার কন্যাটি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। বনমালা যখন পিত্রালয়ে আসে তখন তাহার কন্যা সইমার আকার দেখিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহার মাতা তাহার মুখে চাপা দিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। ইন্দু এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছে যে, যে কাজ তাহার করিতে নাই তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে নাই। সে নীরবে জীবন-ভার বহন করিয়া চলিয়া যায়।

শরতের পূর্ণিমার চন্দ্রকলা লইয়া বিধি বোধ হয় ইন্দুবালাকে গঠন করিয়াছিলেন। সে যখন কিশোরী, কোমরে কাপড় জড়াইয়া পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, তখন গ্রাম্য কৃষকবর্গ তাহার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইত, মনে করিত নীল আকাশ হইতে বিজলী নামিয়া তাহাদিগের ধূলি-ধূসর-পথে খেলিয়া বেড়াইতেছে। কৈশোর অতিক্রম করিয়া সে যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। বসন-ভূষণ-বিহীনা, প্রসাধন-শূন্যা, তরুণী বিধবা পিতৃগৃহে পুষ্প-স্তবকের ন্যায় শোভা পাইত; দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত যেন যূথিকা-গুচ্ছনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিতা রহিয়াছে। মাতা লোক-

নিন্দার ভয়ে কন্যাকে শুভ্র বসন পরিতে দিতেন না, ইন্দু মলিন বসনেই দিন যাপন করিত। লোকে তাহাকে দেখিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অনলশিখা জ্ঞানে মস্তক অবনত করিত।

গৌরসুন্দর মিত্র গ্রামের একজন প্রধান ধনী। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায় ও ভাগ্যবলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। চঞ্চলা কমলা তাঁহার গৃহে আসিয়া কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসীতে গৌরসুন্দরের বিশাল বাসভবন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। সংসারে তাঁহার কোন অভাব ছিল না, কিন্তু তথাপি বহুকাল তাঁহার মুখে কেহ হাসি দেখে নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে গৌরসুন্দরের হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল; একমাত্র কন্যার বৈধব্য তাঁহার বুকে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পর আর কেহ তাঁহাকে হাসিতে দেখে নাই।

(২)

"আমার চিরসঞ্চিত এস হে, আমার চিতবাঞ্ছিত এস!
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস।"—

যে গাহিতেছিল তাহার কণ্ঠ বড় মধুর। কীর্ত্তনের মধুর স্বর চারিদিক যেন মাতাইয়া তুলিতেছে। গীতধ্বনি পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে উত্থিত হইতেছিল, তাহা শুনিয়া তৃষ্ণাকুল মৃগযূথ নদীতীরে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুর শিলাসঙ্কুল পার্ব্বত্য উপত্যকায় তেমন মধুর শব্দ কেহ কখনও শুনে নাই। যে ধ্বনি একদিন যবনের বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছিল, তাহা কঠিন পাষাণের কাঠিন্য দূর করিয়া কোমল শয্যায় পরিণত করিয়া দিল। ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী-তীরে পাষাণ খণ্ডের উপরে বসিয়া আর

একজন তন্ময় হইয়া সে গান শুনিতেছিল। সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে সে প্রখর রৌদ্রে শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া রহিয়াছে; সে বিস্মৃতা হইয়া গিয়াছিল যে, সে একাকিনী গৃহ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে, জন-শূন্য অরণ্যসঙ্কুল উপত্যকায় সঙ্গীত শুনিয়া সে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছে। সে দেখিতেছিল যে, বসন্তের পূর্ণিমায় যমুনা-পুলিনে তাহার শ্যামসুন্দর বংশী-বাদন করিতেছে। সে গৃহে ফিরিতেছিল, কিন্তু সঙ্গীতের মোহমন্ত্র তাহাকে অহল্যার ন্যায় পাষাণে পরিণত করিয়াছে। সে দেখিতেছিল তাহার বংশীধারী শ্যামসুন্দর, সে দেখিতেছিল কেবলমাত্র দুইটি নীল নয়ন, তাহার উপরে যুগ্ম ভ্রুর ঘন কৃষ্ণ রেখা আর চন্দনচর্চ্চিত ললাট—

"আমার বক্ষে ফিরিয়া এস হে, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস!
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস।"

কে যেন গাহিতে গাহিতে দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিতেছিল। দূরে গ্রামপ্রান্তে কৃষক বালক গোধূম ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কম্পিত হৃদয়ে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল নিশ্চয়ই তাহার উপর উপদেবতার দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন মধুরকণ্ঠ কখনও কি মানুষের হইয়া থাকে। সঙ্গীত একবার থামিল—আবার শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও বনরাজি কম্পিত করিয়া সুধার উৎস উথলিয়া উঠিল—

"আমার মুখের হাসিতে এস হে, আমার চোখের সলিলে এস!
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস।"

যে রমণী শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া মুগ্ধা হইয়া সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিল, তাহার পরিচ্ছদ দেখিলে বঙ্গদেশবাসিনী বলিয়া বোধ হয়, বেশ দেখিলে বোধ হয় সে হিন্দুর ঘরের বিধবা। বনমধ্যে গায়ক যেদিকে

চাহিয়াছিল রমণী সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। গায়ক যত দূরবর্ত্তী হইতেছিল, গীতধ্বনি ততই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তখনও শোনা যাইতেছিল;

"আমার সকল স্মরণে এস হে, আমার সকল ভরমে এস!
আমার ধরম-করম, সোহাগ-সরম, জনম মরণে এস।"

ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সঙ্গীতধ্বনি থামিয়া গেল! হঠাৎ দিগন্ত যেন ইন্দ্রজাল মুক্ত হইল, মৃগযূথ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; স্রোতস্বিনী এতক্ষণ থামিয়াছিল, আবার কুলুকুলু রবে বহিতে আরম্ভ করিল, পাষাণ আবার কঠিন হইয়া উঠিল। কে যেন দারুণ আঘাত করিয়া রমণীর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। বাসন্তী পূর্ণিমা সূর্য্য কিরণে মিলাইয়া গেল, যমুনাপুলিন ধূলির ন্যায় উড়িয়া গেল, দিগন্ত যেন একটু টলিল, আবার কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত ঘুরিতে লাগিল। রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়া শিলাখণ্ডের পার্শ্বে পড়িয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে আরও দুইটি বঙ্গদেশীয়া রমণী বনমধ্য হইতে নির্গত হইয়া সেই স্থানের নিকটে আসিলেন। উভয়েই সধবা; একজন প্রৌঢ়া, দ্বিতীয়া তরুণী। দ্বিতীয়া প্রৌঢ়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই থানটাই না মা?"

প্রৌঢ়া। কি জানি মা আমি কিছু ঠিক পাচ্ছি না।

দ্বিতীয়া। এই থানটাইত, ঐ যে সেই বড় পাথরখানা দেখতে পাচ্চি।

উভয়ে দ্রুতপদে শিলাখণ্ডের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যেন শেফালিকার একটি স্তূপ শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। কাতরকণ্ঠে প্রৌঢ়া ডাকিলেন, "ইন্দু!"

যুবতী। আপনাকে কতদিন বারণ করেছি যে একাদশীর দিন ইন্দুকে নিয়ে বেরুবেন না।

প্রৌঢ়া। আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা, বাছা! ইন্দুর কি সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াল?

এই কথা বলিয়া প্রৌঢ়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। যুবতী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া ঝরণা হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিয়া ইন্দুর চোখে মুখে দিতে লাগিলেন। একদণ্ড পরে তাহার জ্ঞান হইল, মাতা ও ভ্রাতৃবধূ বহু কষ্টে তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

বৃদ্ধাবস্থায় গৌরসুন্দর মিত্র কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিতে বসিয়াছিলেন। বহু কষ্টে রোগ মুক্ত করিয়া চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই জন্য গৌরসুন্দর বাবু সমস্ত পরিবার লইয়া চুনারে আসিয়াছেন। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে মহিলাগণ পর্ব্বতমালার চরণপ্রান্তে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন! যে দিনের কথা পূর্ব্বে বলা হইল, সেদিন তাঁহারা পর্ব্বতের উপত্যকায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। গৌরসুন্দরবাবু তখন ধীরে ধীরে বল ফিরিয়া পাইতেছেন।

(৩)

কক্ষের প্রাচীরে একখানি বহু পুরাতন ফটোগ্রাফ ঝুলান থাকিত। তাহাতে যে চিত্র ছিল তাহা বহু পূর্ব্বে মিলাইয়া গিয়াছে, পরে কোন ব্যক্তি মসী দিয়া তাহার সংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহাতে এখন মুখের ছায়া, চক্ষু দুইটি এবং ভ্রূযুগ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই। প্রতিদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া ইন্দু চিত্রখানি খুলিয়া লয়। তাহা

লইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে। পরে আবার তাহা ঝুলাইয়া রাখে। প্রচলিত প্রথানুসারে ইন্দু চিত্রখানিকে প্রণাম করেনা বা তাহার পূজা করেনা; কেবল কোলে করিয়া বসিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে কালি দিয়া তাহার সংস্কার করিবার চেষ্টা করে।

বিবাহের সময়ে ফটোগ্রাফখানি ইন্দুর পিতৃগৃহে আসিয়াছিল। সে বিধবা হইবার পরে তাহার মাতা ফটোগ্রাফখানি বাঁধাইয়া তাহাকে দিয়াছিলেন। সেখানি যতদিন স্পষ্ট ছিল ততদিন লজ্জায় তাহার দিকে চাহিত না। যখন সেদিকে চাহিতে আরম্ভ করিল, তখন ছবিখানি মিলাইয়া আসিতেছে, কেবল চক্ষু দুটি ও ভ্রূযুগল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহার পর ছবিখানি যেমন মিলাইয়া যাইতে লাগিল, ইন্দু কালি দিয়া তাহার সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে দাঁড়াইল যে, দশ বৎসর পরে, ফটোগ্রাফের পরিবর্ত্তে, মসীলিপ্ত পীতবর্ণের একখানি মলিন কাগজ দেখা যাইত। তাহার যে কি মাধুর্য্য, তাহা ইন্দুই বুঝিত; মসী দিয়া চিত্রের যে কি সংস্কার হইয়াছিল, তাহাও সেই বুঝিত। চিত্রখানি তাহার প্রিয় বলিয়া কেহ কোন কথা বলিত না। ইন্দু চিরকালই মাতার নিকটে শয়ন করিত, সেদিনও মাতার নিকট শয়ন করিয়াছিল; কিন্তু কোন মতেই ঘুমাইতে পারিতেছিল না, বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল তাহার বুকের উপর কে যেন একটা গুরুভার দ্রব্য চাপাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দু উঠিয়া বসিল; বসিয়া একটু আরাম বোধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। তাহার পর সে দেখিতে পাইল যে চিত্রখানা যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত ছবিখানা

স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞান হইবার পরে তাহার বড় ইচ্ছা হইত যে, অন্ততঃ স্বপ্নেও একবার স্বামীকে দেখে ; কিন্তু তাহার সে আশা কখনও পূর্ণ হয় নাই। আজ সেই পুরাতন ছবিখানাকে নূতন হইতে দেখিয়া সে বড়ই আনন্দিতা হইল। ধীরে ধীরে সমস্ত চিত্রখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল! বিস্মিত হইয়া ইন্দু চাহিয়া দেখিল, চিত্রে অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। বিচিত্র বসন পরিহিত শ্যামবর্ণ যুবামূর্ত্তি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বংশীবাদন করিতেছে ; কিন্তু তাঁহার চক্ষুদ্বয় ও ভ্রূযুগল তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত।

ক্রমে বাঁশীও সজীব হইয়া উঠিল। একি! বাঁশীর স্বরও যে তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত। আর একদিন যমুনা-সৈকতে চন্দ্রকিরণে বাঁশী গলিয়া সুধাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেদিনও সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, কদম্বমূলে বাঁশী-হাতে শ্যামসুন্দর দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু তাহার সেদিনের শ্যামসুন্দর যুগলভ্রুর নীচে দুটি চক্ষু মাত্র। আজি সে শ্যাম-সুন্দরের পূর্ণরূপ দেখিতে পাইয়াছে। তাহার ক্লান্তি দূর হইল, মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল যে, সে তাহার মৃত পতিকেই দেখিতে পাইতেছে। একবার ভাবিল এই রূপ ত কতচিত্রে দেখিয়াছি, কতবার বংশী হস্তে যশোদা-নন্দনের চিত্র দেখিয়াছি। ইহাই কি সেই রূপ? আবার ভাবিল—সেই নয়নদ্বয়, সেই আকর্ণলম্বিত যুগ্ম-ভ্রূ কোথা হইতে আসিবে? শয্যায় বসিয়া ইন্দু এক মনে চিত্র দেখিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল ; বিস্মিতা হইয়া ইন্দু শুনিল, বাঁশী গান ধরিয়াছে, মানুষের মত কথা কহিতেছে—

"নিকুঞ্জে দখিণা বায়, করিছে হায় হায়,
লতা পাতা হেলে দুলে, ডাকিছে ফিরে ফিরে,
দুজনে দেখা হল মধু যামিনীরে।"

তাহা হইলে পিতার কথা সত্য, শ্যামসুন্দর সত্যই তাহার পতি। ইন্দুর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে স্থির করিল যে সে একবার মাত্র দেখিবে। একবার—দুইবার নহে। সে দূর হইতে কেবল একবার দেখিয়া আসিবে। তাহার দেখিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিল ; সে মনে মনে ভাবিল সে ত কেবল দেখিতে চাহে, চরণপ্রান্ত স্পর্শ করিবার ভরসাও রাখে না। আর সকলে স্বামীকে লইয়া মৃণ্ময় পুত্তলিকার ন্যায় খেলা করিয়া থাকে, সে কেবল দেখিতে চাহে—

"দুজনে দেখা হ'ল মধু যামিনীরে,
কোন কথা কহিল না চলিয়া গেল ধীরে—।"

বাঁশী কাহার কথা কহিতেছে? একি তাহার কথা? স্বর ক্রমশঃ কাছে, আসিতেছে। ইন্দু উঠিল, বহুকষ্টে কাপড় খানা জড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল। বাহিরে জ্যোছনার রজত ধারায় জগৎ হাসিতেছিল, শ্যামা রজনী পরাস্ত হইয়া বৃক্ষতলে ও পর্ব্বতের সানুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, মৃদু মন্দ মারুত হিল্লোলে গঙ্গাবক্ষ নাচিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার উপরে জ্যোছনালোক পড়িয়া আলোক-মালার সৃষ্টি করিতেছিল। জগৎ নীরব নিস্তব্ধ ; সেই বিশাল নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দূরে কে গাহিয়া উঠিল—

"দুজনের আঁখি-বারি গোপনে গেল ঝরে,
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে ;

আরম্ভ হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে ;—।”

ইন্দু সভয়ে চাহিয়া দেখিল, গঙ্গা-সৈকতে শুভ্রবালুকা-ক্ষেত্রে অস্পষ্ট মূর্ত্তি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। গায়ক পুরুষ, পরিধানে শ্বেত বস্ত্র, কিন্তু ইন্দু তাহা দেখিতে পাইতেছিল না। সে দেখিতেছিল সিক্ত বালুকা-সৈকতে মোহনমূরতি নব-জলধর-শ্যাম নাচিয়া চলিয়াছে। বাঁশীর বাদ্যের তালে তালে, রাঙা চরণের তালে তালে, রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজিতেছে। পীতবাস জ্যোছনা-ধারায় রজত-ধবল হইয়া গিয়াছে, যমুনা-পুলিনে শ্যামসুন্দর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে। চূড়ায় শিখি-পাখা হেলিতেছে, দুলিতেছে, তালে তালে ভ্রমরকৃষ্ণ অলকগুচ্ছ লম্ফ দিয়া পৃষ্ঠের উপর পতিত হইতেছে। এই তাহার শ্যামসুন্দর, এই তাহার মানস-মোহন। অশ্রুর উৎস কোথায় লুক্কায়িত ছিল, জলে তাহার নয়ন দুটি ভরিয়া আসিল ; তথাপি সে দেখিতে পাইল চাঁদনী যামিনীতে যমুনা-পুলিনে বংশীধর নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। নয়ন দুটি মুদিয়া আসিল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে প্রাচীর আশ্রয় করিয়া ইন্দু ছাদের উপরে বসিয়া পড়িল। তখনও দূরে মৃদু মৃদু ধ্বনি হইতেছিল—

“আরত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে।”

ইন্দু মনে মনে অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতেছিল। এত তৃপ্তি তাহার জীবনে সে কখনও পায় নাই। শীতল নিশীথ সমীরণ আসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছিল। সে ধীরে ধীরে মুক্ত ছাদে ঘুমাইয়া পড়িল।

আহ্বান।

(৪)

ডাক্তার আসিয়া বলিল, ইন্দু হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। রজনীর বিবরণ শুনিয়া মহিলারা স্থির করিলেন যে, কোন উপদেবতা আসিয়া ইন্দুকে আশ্রয় করিয়াছে। তন্দ্রার ঘোরে সেদিন অনেকেই গান শুনিয়াছিলেন; তাহার পর গ্রামের কৃষকবালকগণ আসিয়া যখন বলিয়া গেল যে দেওয়ানা জিন বনে বনে উপত্যকায় উপত্যকায় অতি মধুর স্বরে গান গাহিয়া বেড়ায়, তখন সকলেরই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গেল।

বুঝিল না কেবল ইন্দু। রজনীর প্রত্যেক ঘটনা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, সে যাহা দেখিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ,—স্বপ্ন নহে। সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা কাহাকে কাহাকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। ইন্দু সেই অবধি গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

তাহার একমাত্র দুঃখ এই যে, বেড়াইবার সময় কেহ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় না। সে মনে মনে ভাবিয়া থাকে যে বেড়াইতে গেলে হয় ত তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। যেখানে বনপথে মৃগশিশু স্তম্ভিত হইয়া কোকিল-কূজন শ্রবণ করে, বিশাল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী একটানা গান গাহিয়া যায়, মানবের পাদস্পর্শে যেখানে শ্যামল শষ্প-শয্যা শুকাইয়া যায় নাই, সেইখানে হয়ত নূপুর-নিক্কণ শ্রুত হইয়া থাকে, রাঙা চরণ দুখানি হরিৎ তৃণ-ক্ষেত্রের উপর দিয়া নাচিয়া চলিয়া যায়, অথচ দূর্ব্বাদলের একটিও দল ছিঁড়িয়া পড়ে না। সেইখানে যাইবার জন্য ইন্দুর প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; কিন্তু হায়, তাহার কথায়

কেহই কর্ণপাত করেনা। সকলে যখন বেড়াইতে যায়, ইন্দু তখন গৃহের নিকটবর্ত্তী একটি ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখে গিয়া বসিয়া থাকে।

মন্দিরটি বহু পুরাতন, কত পুরাতন কেহ বলিতে পারে না। তাহাতে কি বিগ্রহ ছিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত মন্দিরের সৌভাগ্যও অদৃশ্য হইয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ অশ্বথ ও বট তাহার শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে; মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার পরিবর্ত্তে নিশাচরগণ বাস করিয়া থাকে। পুরাতন মন্দিরটির সম্মুখে একটি পুষ্করিণী ছিল, কালে তাহাও ভরিয়া আসিয়াছে; প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট বনময় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসিগণ এখনও সেখানে পূজা দিতে আসিয়া, থাকে, অমাবস্যায়, পূর্ণিমায় জীর্ণ মন্দিরের প্রাঙ্গণটি লোকে ভরিয়া যায়। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া ইন্দুকে দেখে, ভাবে বনমধ্যে রজনীগন্ধার স্তবক কোথা হইতে আসিল। ইন্দু লজ্জায় দূরে সরিয়া যায়।

দ্বিপ্রহরে অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া ইন্দু পুষ্করিণীর পঙ্কিল জলে মৃণালের অপূর্ব্ব শোভা দেখিত, আর ভাবিত সে যদি একবার এই পথ দিয়া যায়, তাহা হইলে দিবালোকে প্রাণ ভরিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লয়। সে ত আর কিছুই চাহে না, শুধু চোখের দেখা। গ্রামের বৃদ্ধারা বলিতেন "শ্যামসুন্দরের দর্শন দুর্লভ; কত তপস্যায়, কত আয়াসে তাঁহার দর্শন মিলে।" সে ভাবিত, সে এত কি পুণ্য করিয়াছে যে সেই দুর্ল্লভ দর্শনের সাক্ষাৎ পাইবে। সে আবার ভাবিত, যাহারা সাধনা করিয়া, তপস্যা করিয়া শ্যামসুন্দরের দর্শন পায়, শ্যামসুন্দর ত তাহাদিগের নহে; এই জন্য তাহাদিগের অত কষ্ট করিতে হয়। কিন্তু শ্যামসুন্দর ত তাহার

নিজস্ব; সেই জন্যই সে দর্শন পাইয়াছে। বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায় শ্যামসুন্দর তাহার নিকটে আসিবে, ইহাই তাহার বিশ্বাস।

সেই চক্ষু দুটি, সেই ভ্রূযুগল, যে মুখখানিতে আছে, তাহা যে তাহার নিজস্ব, তাহার জন্য সাধনার, আরাধনার আবশ্যক নাই—দুঃখ, কষ্ট, তপস্যার প্রয়োজন নাই—সে তাহার নিজের। সে তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী, এই ভাবিয়া ইন্দু অধিকারগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইত। তাহার ক্ষুদ্র সইটি তাহার চারিহাত দীর্ঘ স্বামিটীকে অঞ্চলে বাঁধিয়া কেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহার নিজস্ব বলিয়াই ত! সে না হয় তাহার সইয়ের মত অত সৌভাগ্যবতী নহে; তাই বলিয়া কি তাহাকে একবার দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে? কখনই নহে। ইন্দু মন বাঁধিয়া বসিয়া রহিল। দিনের পর দিন যায় শ্যামসুন্দর ত আসে না।

বাঁশীর গান শুনিবার জন্য ইন্দু উৎকর্ণ হইয়া থাকিত। পলে পলে তাহার মনে হইত ঐ বুঝি বনরাজি কম্পিত হইয়া উঠিল, বাঁশীর ঝঙ্কারে জগৎ উন্মত্ত হইয়া উঠিল, ঐ বুঝি সে আসিল; রাঙা চরণ দুখানি দূর্ব্বাক্ষেত্রের উপর দিয়া নাচিয়া গেল। যখন সে দেখিত কিছুই না, তখন সে বড় হতাশ হইয়া পড়িত। একদিন সত্য সত্যই বাঁশী বাজিল। ইন্দু প্রথমে বিশ্বাস করে নাই। ক্রমে স্বর স্পষ্ট হইয়া উঠিল—

"আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুর্মুহু
আজ কাননে ঐ বাঁশী বাজে;
মান করে থাকা আজ কি সাজে।"—

বাঁশী অন্যদিনের মত আজ কথায় গান ধরিয়াছে—

"আজ মধুরে মিশাবি মধু
পরাণ বঁধু!
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে
মান করে থাকা আজ কি সাজে!"—

ইন্দুর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। যেদিক হইতে সঙ্গীত ধ্বনি শোনা যাইতেছিল সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল; দেখিল সত্য সত্যই কে আসিতেছে। আবার গান—

"বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ কি সাজে?
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে,
চল চল কুঞ্জ-মাঝে।"—

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ইন্দু চাহিয়া দেখিল, যে গাহিতেছে তাহার হাতে বাঁশী নাই, চরণে নূপুর নাই, অঙ্গে পীতবাস নাই, চূড়ায় শিখিপাখা নাই। তখন তাহার মনে বড় অভিমান হইল; যদি দেখা দিতে আসিলে, তবে ছদ্মবেশ কেন? যে গাহিতেছিল তাহার সন্ন্যাসীর বেশ, কুঞ্চিত কেশরাশি উড়িয়া বেড়াইতেছিল; পরিধানে গৈরিক বসন, চরণদ্বয় নগ্ন। সে যখন নিকটে আসিল, তখন ইন্দু অভিমান ভুলিয়া গেল, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গায়ক মন্দিরের নিকটে আসিয়া ইন্দুকে দেখিল, দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ইন্দু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আজ এবেশে কেন?" গায়ক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "কি বেশে? আমিত নিত্যই এই বেশে আসি।"

ইন্দু ভাবিল, একি তবে সে নহে? তবে কি তাহার ভুল হইয়াছে? সে আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল; না—সেই বটে। সেই চক্ষু দুইটি, সেই আকর্ণবিশ্রান্ত ভ্রূযুগল, কেবল কপোলে ও ললাটে চন্দনরেখা নাই। ইন্দু যতক্ষণ তাহাকে দেখিতেছিল, ততক্ষণ গায়কও তাহার দিকে চাহিয়াছিল। ইন্দু স্থির করিল যে, তাহার শ্যামসুন্দর আজ ছদ্মবেশে আসিয়াছে; আজি কিছুতেই পরিচয় দিবে না, সুতরাং জিজ্ঞাসা বৃথা। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিল "আবার কবে আসিবে?" গায়ক আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কে? আমিত আপনাকে কখনও দেখি নাই!" ইন্দু বলিল "তবে কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?" উত্তর হইল "না"। ইন্দু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল, ভাবিল শ্যামসুন্দর আজ বড়ই দুষ্ট হইয়াছে, কিছুতেই মানিবেনা। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "ইন্দু," কিন্তু ইন্দু তাহা শুনিতে পাইল না। গায়ক তখন নূতন গান ধরিয়াছে—

"ওহে জীবনবল্লভ!
আমি অপরাধ যদি করে থাকি পদে,
না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয়, দিওহে দিও
বেদনা নব নব।"

পশ্চাতে পদশব্দ হইল। ইন্দু তাহা শুনিতে পাইল না। তাহার ভ্রাতৃবধূ ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইন্দু চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

"ইন্দু ও—কে?" ইন্দু হাসিয়া বলিল "তুমি চিনিতে পার নাই? এই সেই।"

"সেই কে ইন্দু?"

"চিনিতে পারিলে না?"

"ছিঃ ইন্দু, এমন কাজ করিতে নাই।"

"কেন বউ দিদি?"

"তোমার জ্ঞান হইয়াছে। তোমার কি পর-পুরুষের সহিত আলাপ করা উচিত?" "পর-পুরুষ? একি তবে সে নহে?"

ইন্দু এই বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। গায়ক তখনও গাহিতেছিল—

"তবু ফেলোনা দূরে, দিবস শেষে,
ডেকে নিও চরণে;
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার
মৃত্যু-আঁধার ভব।"

ইন্দুর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে শয়ন করিল। তাহার পর একটু শান্ত হইয়া সে বলিল "বউদিদি, একি তবে সে নয়? তুমি ভুল করিয়াছ! এই সেই। আমি দশ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি। আমি কখনই ভুল করি নাই।" ইন্দু ক্রমশঃ চারিদিক আঁধার দেখিতেছিল, অন্ধকার ভেদ করিয়া কাহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সেই! সেত ভুল করে নাই। এই তাহার শ্যামসুন্দর। এই নীরদ বরণ, মানসমোহন মূর্ত্তি সে কতবার দেখিয়াছে। শ্যামসুন্দর এইমাত্র ছদ্মবেশে আসিয়াছিল



ইন্দু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আজ এ দেশে কেন?"—পৃঃ ৬৮

কিন্তু সেত তাহার ব্যথিত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে নাই, ডাকিবামাত্র দেখা দিয়াছে।

ইন্দু বলিল "তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ রাঙা চরণ নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, তুমি কি নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ না? ঐ শোন, বাঁশী ডাকিয়া ডাকিয়া বাজিতেছে। আমি ভুল করি নাই। কেন ভুল করিব? এযে আমার আপনার।"

নিমীলিত নেত্রে ইন্দু দেখিতেছিল, শ্যামসুন্দর নাচিয়া নাচিয়া আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে, কাতর কণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিতেছে, যেন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। বাঁশী যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছে—

"আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত নাথ হে ফিরে এস!
এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস।"——

তাহার আর ধৈর্য্য রহিল না, বাঁশীর স্বর তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ইন্দু চলিয়া গেল।

পরিবর্ত্তন।

"ওমা কি ঘেন্না, কি লজ্জা, এমন তো' কখনও দেখিনি! হ'লেই বা সৎ-শাশুড়ী, তাই ব'লে কি কচি বৌটাকে এমন ক'রে মেরে ফেল্‌তে হয়? আহা! দুধের মেয়ে ওকি কখনও একাদশী কোর্ত্তে পারে! তুই আবার আমাকে শাস্ত্র দেখাতে আসিস্‌, তোর একটু লজ্জা হ'ল না। আমি না তোর মার বয়েসী! শাস্তর! বাচ্‌পোতের মেয়েটা ন'বছর বয়সে রাঁড় হ'ল, হরি বাচ্‌পোত, তখন তার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, সে নিজে হাতে তাকে একাদশীর দিন ভাত খাইয়েছে, তা' আমি নিজ চক্ষে দেখিছি। আম্বুবতীর তিন দিন আগে থেকে বড় হাঁড়ায় ক'রে ভাত ভিজিয়ে রাখত। মিত্তিররা ত' না হয় একে বড় লোক, তায় কায়েত, তাদের কথা ছেড়েই দিলুম। তুই না মেয়ের মা, পরের মেয়ের সঙ্গে এ রকম ব্যাভার কোর্ত্তে তোর একটু বাধে না! গা! তোর মেয়ে কি কখনও রাঁড় হবে না, কখনও একাদশী কোর্ত্তে হবে না? আমি আজকের নই, আমি এখন মরছি নি, আমিই আবার আস্‌বো, দেখে যাবো ধম্মো এর বিচার করেন কিনা! এই বোশেখ মাসের রদ্দুর, তুই কিনা কচি মেয়েটাকে এক ফোঁটা জল না দিয়ে রেখেছিস্‌। এর ফল তোকে হাতে হাতে ভুগতে হবে। ধম্মে সইবে না, সইবে না!"

দম বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় বামা ঠাকুরঝিকে বাধ্য হইয়া থামিতে হইল। বৈশাখের দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে চারিদিক দগ্ধ

হইয়া যাইতেছিল। একটি বৃহৎ অট্টালিকার অন্দর মহলে চণ্ডীমণ্ডপের দালানে দাঁড়াইয়া বামা ঠাকুরঝি ভীষণ রণ-রঙ্গের অভিনয় করিতেছিলেন। বামা ঠাকুরঝি বন্দীপুর গ্রামের বধূ মাত্রেরই ঠাকুরঝি এবং কন্যা মাত্রেরই বামা দিদি। বেঁটেখাট গড়ন, পাকা মিসির মত রং, বয়স অনিশ্চিত, যুবতী বলিলেও চলে, অথবা প্রৌঢ়া বলিলেও চলে। ঠাকুরঝি চির-সধবা, পরণে একখানি লাল কস্তা পেড়ে সাড়ী, হাতে দুগাছি অতি প্রাচীন সোনার বালা এবং সীমন্তে সুদীর্ঘ সিন্দুর-লেখা! বামা ঠাকুরঝি সধবা বটে, কিন্তু গ্রামে কেহ কখনও ঠাকুর জামাইকে আসিতে দেখে নাই। গ্রামের বধূরা কখনও ঠাকুর জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা করিত না, যদি কোন প্রগল্‌ভা মেয়ে বাপের বাড়ী আসিয়া বামা দিদিকে ঠাট্টা করিয়া তাহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে বামা তাহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিত। কোন্দলে কেহ কখনও বামাকে জিতিতে পারে নাই, সে যেখানে চেঁচাইয়া জিতিতে পারিত না, সেখানে কাঁদিয়া জিতিত। পিতৃ, মাতৃ-ভ্রাতৃ, পুত্র-কন্যা-হীনা বন্ধ্যা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বন্দীপুর গ্রামের সকলেই শমনের ন্যায় ভয় করিত এবং সম্ভব হইলে দূর হইতে দেখিয়া সরিয়া পড়িত।

এ হেন দিগ্বিজয়ী বামা ঠাকুরঝির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পত্নী দারুণ গ্রীষ্মেও অষ্টমী পূজার জন্য উৎসর্গীকৃত ছাগ-শিশুর ন্যায় কাঁপিতেছিলেন।

বন্দীপুর নদীয়া জেলায় একখানি বিশিষ্ট গ্রাম। গ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ বহুকালের প্রাচীন জমীদার। লোকে বলিত তাঁহারা নবাবী আমলের জমিদার। চারিটি পুত্র রাখিয়া হরবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের

প্রথমা পত্নী যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন বাধ্য হইয়া সংসার রক্ষার জন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কারণ হরবল্লভের আপনার বলিতে সংসারে অপর কেহ ছিল না! দেখিয়া শুনিয়া নিজে পছন্দ করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাতৃহীনা কন্যাকে হরবল্লভ যখন বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন, তখন তাহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। গ্রামের লোকে কত কথা বলিল, বৃদ্ধেরা বলিলেন, হরবল্লভ একটা হা'ঘরের মেয়ে আনিয়াছে, এইবার মুখুয্যেদের অচলা লক্ষ্মী বুঝি চঞ্চলা হইলেন। গ্রাম্য-গেজেটগণ বলিয়া বেড়াইলেন যে নূতন বৌ আসিয়াই ছেলে চারিটার মুখের ভাত কাড়িয়া লইয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছে, হরবল্লভ ইহার মধ্যেই ভেড়া হইয়া গিয়াছে! কিন্তু ফলে কাহারও কথা সত্য হইল না, বিমাতার কি এক আশ্চর্য্য গুণে বশীভূত হইয়া মাতৃহীন শিশুচতুষ্টয় বিমাতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মুখুয্যেদের নূতনবধূ অঘটন ঘটাইল দেখিয়া গ্রামে যত ঈর্ষান্বিতা পরশ্রীকাতরা রমণী ছিলেন তাঁহারা একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। পাড়ায় পাড়ায় মজলিস বসিয়া গেল, ঘোরতর তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, নূতন বধূ নিশ্চয়ই ডাকিনী। যে প্রবল বলে, প্রবল প্রতাপান্বিত হরবল্লভ মুখোপাধ্যায় মেষশাবকে পরিণত হইয়াছেন, তাহার বলে যে মাতৃহীন অনাথ শিশুচতুষ্টয় বশীভূত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? স্থির হইয়া গেল, ছেলে চারিটার রক্ষার আর কোনও উপায় নাই! হরবল্লভের নূতন স্ত্রী নীরবে সাধারণ গৃহস্থ বধূর ন্যায় সংসারে মিশিয়া গেল। তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার সুখসম্পদ দেখিয়া যাহারা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারা তুষের আগুনের ন্যায় ভিতরে

ভিতরে পুড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নূতন বধূ বিবাহিত জীবনের বিশ বৎসর কাটাইয়া দিল, কিন্তু বন্দীপুর গ্রামে তখনও তাহার "নূতন বৌ" নাম ঘুচিল না। হরবল্লভের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দুই তিনটী সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটী কন্যা মাত্র জীবিতা ছিল, পিতা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'শেফালিকা'। অনুমান পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হরবল্লভের মৃত্যু হইয়াছিল, তখন তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় ও কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র সংসারের ভার লইয়াছিলেন। তিনি ধীর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শান্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ দোষ ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া পাঠাভ্যাস কালে তিনি সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া পিতার সহস্র তিরস্কার ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সামান্য মাত্র সুরা উদরস্থ হইলে তাঁহার আর জ্ঞান থাকিত না। পিতার মৃত্যুর পরে ছয় মাস কাল হেমচন্দ্র জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় অত্যধিক সুরাপান হেতু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। একবৎসরের মধ্যে দুইটী শোক পাইয়া হরবল্লভের পত্নী শয্যা গ্রহণ করিলেন। তখন হেমচন্দ্রের পত্নী নয়নমঞ্জরীর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। হরবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র পরেশচন্দ্র জন্মাবধি সংসারের প্রতি উদাসীন, তিনি বাল্যকালাবধি সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সংসারের বা বিষয়সম্পত্তির ধার ধারিতেন না। তাঁহার ন্যায় সুন্দর, সুপুরুষ, সুকণ্ঠ গায়ক দেশে অত্যন্ত বিরল ছিল। তাঁহার পত্নী নিঃসন্তান বলিয়া মনের দুঃখে কাহারও সহিত মিশিতেন না। তৃতীয় পুত্র নরেশচন্দ্র হর-

বল্লভ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং বিষয়-কর্ম্মে পারদর্শী, কিন্তু কূটবুদ্ধির জন্য পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। তিনি ধনীর গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী নিরুপমা দেবী পিতার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে, এবং শ্বশুরের জীবনকালে দুইটী পুত্রের জননী হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; তবে শ্বশুর যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাধ্য হইয়া স্বামীর বিমাতাকে মানিয়া চলিতেন। হর-বল্লভের চতুর্থ পুত্রের নাম যোগেশচন্দ্র, পিতার মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর হরবল্লভের পত্নী প্রায় দুই বৎসর কাল সংসারের কার্য্য দেখেন নাই। হেমচন্দ্রের পত্নী তখন সবে বিধবা হইয়াছেন, মধ্যমের পত্নী সন্তান-কামনায় দেবসেবা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, সংসারের দিকে চাহিয়াও দেখিতেন না। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া সেজ-বৌকে সংসারের ভার লইতে হইল। কর্ত্তৃত্ব বড় মধুর, যাঁহারা একবার ক্ষমতা হাতে পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহা ছাড়িতে পারেন না, বিশেষতঃ একবার গৃহিণী হইয়া পুনরায় ঘোমটার আড়ালে নববধূ সাজিতে পারা যায় না। সেজ-বৌত' মানুষ বটে, তাহার ত' রক্ত মাংসের দেহ, সেও পারিল না। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর দুইবৎসর পরে শেফা-লিকা প্রসব করিতে পিত্রালয়ে আসিল, তখন হরবল্লভের পত্নী তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছয় মাসের পুত্র লইয়া কন্যা যখন শ্বশুরা-লয়ে চলিয়া গেল, তখন কার্য্যাভাবে হরবল্লভের পত্নী সংসারে মনোনিবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার স্থান অপরে অধিকার করিয়াছে। সেজ-বৌ ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তিনি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন; তখন হরবল্লভের পত্নী ভাবিয়া

দেখিলেন সংসার ত' তাঁহার নহে, তিনি স্বামী-পুত্রহীনা, 'স্বামীর মৃত্যুর সহিত সংসারের সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে। পুত্র ও পুত্রবধূগণ তাঁহার নহে, তাঁহার যে আপনার, সে অন্যস্থানে সংসার পাতিয়া বসিয়াছে, তখন তিনি ইহকাল ছাড়িয়া পরকালের কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। বিধবা বড় বধূকে আগ্‌লাইয়া রাখা ও দেবসেবা করা, তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল। সেজ-বৌ দেখিল যে শাশুড়ী থাকিতে, বড়-বধূ, মেজ-বধূ থাকিতে, তাহার সংসারে কর্ত্রী হইয়া বসা ভাল দেখায় না, তখন সে বড়-বধূকে ভাঙ্গাইয়া লইবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিল।

একাদশীর দিন প্রাতঃকালে বড়-বধূর মুখে তাম্বুলরাগ দেখিয়া হরবল্লভের পত্নী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন এবং যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। বড়-বৌ তখন সেজ-বৌর নিকট বিশেষ ভরসা পাইয়াছে, শাশুড়ীর মুখের উপর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু সেজ-বৌর ঘরে যাইয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। সেজ-বৌও কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহার পর মধ্যাহ্নে রণচণ্ডীরূপে বামা ঠাকুরঝির আবির্ভাব হইল।

"তুই ভেবেছিস্ কি যে এর ফল তোকে ভুগ্‌তে হবে না, ঘোর কলি হ'লেও এখনও ধর্ম্ম আছেন, এখনও চন্দর স্থর্য্যি উঠ্‌ছে, এই দুধের মেয়েকে একাদশী করান—তোর কি ভাল হবে ভেবেছিস্—তুই কি ভালোর মাথা খাবিনি!' যাতনা-ক্লিষ্টা বিধবা আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে মেজ-বৌ পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা বামা পিসি, তুমি এত কোরে কাকে বল্‌চো গা?" মেজ-বৌকে দেখিয়াই বামাপিসি

রাগে গরগর করিয়া বকিতে বকিতে দ্রুতবেগে সেজ-বৌএর ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মেজ-বৌকে দেখিয়া বামা পিসির পলায়নের একটু বিশেষ কারণ ছিল, বড়-বধূর পিত্রালয়ের দরুণ তাহার সহিত বামা পিসির একটু সম্পর্ক ছিল। একদিন সন্ধ্যার পর বামা পিসি যখন বড়-বধূর ঘর হইতে বাহির হইতেছেন, তখন মেজ-বৌ, তাহাকে, নারায়ণের শীতলের জন্য কলিকাতা হইতে আনীত পঁচিশটি ল্যাংড়া আমের সহিত গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়াছিল, তদবধি বামা পিসির ন্যায় জাঁহাবাজ্ মেয়েও মেজ-বধূকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত।

মেজ-বৌ আসিয়া শাশুড়ীর হাত ধরিয়া উঠাইল, দেখিল ঘামে শাশু-ড়ীর সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, আর চোখ্ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়ি-তেছে। হরবল্লভের স্ত্রী মেজ-বৌএর সাহায্যে শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন, মেজ-বৌ অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কোন কথা জানিতে পারিল না। হতাশ হইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন সেজ-বৌএর ঘর হইতে উচ্চহাস্যধ্বনি উঠিয়া মুখোপাধ্যায়দিগের চক্‌মিলান দালানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। মেজ-বৌ বুঝিল ইহা সেজ-বৌএর বিজয়-দুন্দুভির নিনাদ।

সন্ধ্যাকালে মেজ-বৌ বিস্মিতা হইয়া দেখিল যে, বামা ঠাকুরঝির ভোজনের জন্য রান্নাঘরে বিরাট আয়োজন হইয়াছে। কোন কথা না বলিয়া মেজ-বৌ ধীরে ধীরে শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল, সংসারে তাহার কোনই অধিকার ছিল না, কারণ তাহার স্বামী তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

পরিবর্ত্তন।

"মা, ওমা, ওঠ না মা, তোমার পায়ে পড়ি, ওঠ না মা, বেলা যে এক প্রহর হতে চোল্লো, ওঠ না মা, তুমি না উঠ্‌লে যে ঠাকুর ঘরে যেতে পারছি না।"

দ্বাদশীর দিন প্রভাতে সিক্তবস্ত্রে মেজ-বৌ শাশুড়ীর শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছে। ছোট-বধূ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বৈশাখের বেলা, তখন রৌদ্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, দারুণ উত্তাপে আকাশে সীসার রং ধরিয়াছে। পূজার ঘরের সম্মুখে পুরোহিত আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিতেছেন যে, শিব-মন্দির ও নারায়ণের গৃহ তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই। পুরোহিত তাঁহার জীবনে কখনও এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখেন নাই। সেজ-বৌ ও বড়-বৌ ব্যস্ত হইয়া সমস্ত অন্দরময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ঠাকুর-ঘরের দিকে চাহিয়াও দেখিতেছে না। এমন সময় একখানা বড় গাড়ী আসিয়া অন্দরের দেউড়িতে দাঁড়াইল, কে যেন নামিয়া আসিয়া করুণ গামাকণ্ঠে ডাকিল "মা"। কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেজ-বৌ, ছোট-বৌকে বলিল "ছোট-বৌ, তুই শীগ্‌গির নেমে যা, শিউলি এসেছে, তাকে তোর ঘরে নিয়ে যা, আমি ততক্ষণ মাকে বার করছি।" তাহার পর দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দিয়া, জোরে বলিয়া উঠিল "ওমা, শিউলি এসেছে মা, শীগ্‌গির দোর খোল, ওর সাম্‌নে আমাদের মুখ আর পুড়িও না।" রুদ্ধ দ্বার তথাপিও মুক্ত হইল না।

শেফালিকা ননদ সঙ্গে করিয়া দেবরের বিবাহ উপলক্ষে পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল। তাহার পুত্রটি আসিয়া বাড়ীময় মাতা-মহীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। মাতামহীকে কোথাও না পাইয়া শয়ন-

কক্ষের দ্বারে গিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল "দি'মা, ওদি'মা!" মেজ-বৌ তখন অভিমান ভরে বলিয়া উঠিল 'মা নস্থ ডাক্‌ছে।" এমন সময় দেখিতে দেখিতে শেফালিকা উপরে আসিয়া পড়িল। সে মাতার এক-মাত্র সন্তান, বহুদিন অদর্শনের পর জননীকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। ছোট-বৌ তাহাকে নিজে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, বরঞ্চ সে ছোট-বৌকে ধরিয়া লইয়া উপরে আসিল। ছোট-বৌ তখন তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়াইয়া কুটুম্বিনীর অভ্যর্থনার জন্য নীচে চলিয়া গেল।

শেফালিকা আসিয়া দেখিল যে মাতার শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ, দ্বারের পার্শ্বে মেজ-বৌ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে, আর নস্থ তাহার ছোট ছোট হাত দুখানি দিয়া দুয়ারে ধাক্কা মারিতেছে ও ডাকিতেছে "দি'মা, ও দি'মা।" শেফালিকা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আকুলকণ্ঠে ডাকিল "মা।" ভগ্নহৃদয়ের কোন ছিন্নতন্ত্রীতে সন্তানের করুণ আহ্বান আঘাত করিয়া কি এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি করে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিয়াছে! হরবল্লভের পত্নী আর থাকিতে পারিলেন না, এইবার রুদ্ধদ্বার মুক্ত হইল। কন্যাকে দেখিয়া মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, মাতাপুত্রী দৃঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, আর মেজ-বৌ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

নস্থ দেখিল তাহারই বিলক্ষণ লোক্‌সান্‌। সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন মেজ-বৌ তাহাকে উঠাইয়া লইয়া তাহার মাতামহীর ক্রোড়ে দিল, নস্থ কাঁদিয়া জিতিল এবং সকলের ক্রন্দন থামাইল। তখন শিউলি মেজ-বৌকে বসাইয়া সে যতদূর জানিত তাহা শুনিল, তাহার পরে

হরবল্লভের পত্নী অশ্রুজলের সঙ্গে মিশাইয়া অবশিষ্টটুকু বলিয়া দিলেন।

ইত্যবসরে ছোট-বৌ শেফালিকার ননদকে লইয়া সেজ-বৌএর ঘরে যাইয়া দেখিল যে সে মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া আছে, আর বড়-বৌ তাহার মাথা টিপিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া ছোট-বৌ স্তম্ভিত হইয়া গেল, কারণ অর্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে সেজ-বৌএর চীৎকারে বাড়ীতে কাক-কোকিল বসিতে পারিতেছিল না। সেজ-বৌ বাধ্য হইয়া শেফালিকার ননদকে অভ্যর্থনা করিল। ননদ শেফালিকাকে অনেকক্ষণ না দেখিয়া চঞ্চলা হইতেছিল, কিন্তু ছোটবধূ তাহাকে সেখানে রাখিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

মাতার শয়নকক্ষে শেফালিকা মাতাকে বলিতেছিল "মা, তবে আর কিসের জন্য থাকা, তুমি আমার সঙ্গে চল।" মাতা উত্তর করিলেন "তাই যাব মা, স্বামীর সংসার ব'লে তাই এতদিন পড়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আমাকে না তাড়ালে এরা তিষ্ঠিতে পারবে না। আমি স্বামী-পুত্রহীনা, এদের সংসারে আর আমার কোন প্রয়োজন নাই।" মেজ-বৌ স্থির হইয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে চম্‌কিয়া উঠিতেছিল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "মা তুমি কি সত্যসত্যই আমাদের ছেড়ে যাবে?" তাহার কথা শুনিয়া হরবল্লভের পত্নীর চক্ষু আবার জলে ভরিয়া আসিল, "আমি না গেলে তোদের সংসারে শান্তি আসবে না মা। তাঁর সঙ্গে আমার দিনও ফুরাইয়াছে, তোমাদের হাতে ক'রে মানুষ করিছি, এখন তোমরা নিজের সংসার বুঝে সুঝে নাও।" মেজ-বৌ শাশুড়ীর পা জড়াইয়া কাঁদিয়া পড়িল, বলিল "তুমি যেও না মা, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না,

আমার যে আর কেউ নেই মা!" শ্বশ্রূ বন্ধ্যা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শেফালিকা ধীরে ধীরে উঠিয়া সেজ-বৌএর ঘরে গেল, তাহাকে দেখিয়া কেহ কথা কহিল না, তাহার ইসারায় তাহার ননদ উঠিয়া আসিল। পথে ননন্দা ও ভ্রাতৃবধূতে যে কথোপকথন হইল, তাহা শুনিয়া ননন্দার কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া গেল। তখন উভয়ে উপরে যাইয়া হরবল্লভের পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন, শেফালিকা ও তাহার ননদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে হরবল্লভের পত্নী তখনই বন্দীপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ছোট-বৌ ঠাকুর-ঘরের কাজ সারিয়া শাশুড়ীর নিকট আসিয়া বসিল। পরেশচন্দ্র ও যোগেশচন্দ্র আহার করিতে আসিয়া বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, আহারের সময়ে মাতা তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন না, দুই ভাই নীরবে আহার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। দ্বিপ্রহরের পর নরেশচন্দ্র আসিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, আহারান্তে পুনরায় বাহিরে চলিয়া গেলেন, কি হইয়াছে তাহা কেহই জানিল না। হরবল্লভের পত্নী যখন চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন তখন মেজ-বৌ ও ছোট-বউ কাঁদিয়া কহিল "মা তুমি যদি যাবে ত দ্বাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া যেও না, আমাদিগের অকল্যাণ কোরো না।" হরবল্লভের পত্নী কি ভাবিয়া আহার করিতে সম্মতা হইলেন। তৃতীয় প্রহরে সকলের আহার সমাপ্ত হইল।

শেফালিকার সহিত মা চলিয়া যাইতেছেন, মেজ-বৌ এই সংবাদ স্বামী ও দেবরগণের নিকট পাঠাইয়া দিল। সংবাদ আসিল, মেজ-বাবু ভিন্ন-গ্রামে যাত্রা শুনিতে গিয়াছেন, ছোট-বাবু মাছ ধরিতে গিয়াছেন, সেজ-

বাবু বলিয়া পাঠাইয়াছেন "শিউলির মা যদি চলিয়া যান ত' আমি কি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব ?" লজ্জায় ঘৃণায় মেজ-বৌএর মুখ লাল হইয়া গেল। হরল্লভের পত্নী স্বামীর শয়নকক্ষে ও ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া ধীরপদে গাড়ীতে উঠিলেন, শেফালিকা তাহার পুত্র ও ননদ লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিল, মেজ-বৌ ও ছোট-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিল। তখন সেজ-বৌএর ঘরে মস্ত তাসের আড্ডা বসিয়াছে, হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। যখন চোখ্ মুছিতে মুছিতে মেজ-বৌ ও ছোট-বৌ অন্দরে প্রবেশ করিল তখন বামা ঠাকুরঝি উঠানে পানের পিক্ ফেলিতে আসিয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন "বলি তোদের আবার হলো কি, 'সৎ-শাশুড়ী বিদেয় হলো, ওতো ফোড়া গ'ল্‌ল্,' তার জন্যে আবার চোখে নোনা-পানি কেন ?"

শরতের শেষ বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। এই সময়ে বৈদ্যনাথ মধুপুর অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালীর সমাগম হইয়া থাকে। বৈদ্যনাথে ও মধুপুরে একটি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বাঙ্গালী রমণীর স্বাধীনতা। কোন কোন শৈলাবাসে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কিছু কিছু স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বৈদ্যনাথ বা মধুপুরের নিয়মের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। এই দুই স্থানে আসিয়া বাঙ্গলা দেশের অবরোধ প্রথা যেন উঠিয়া যায়, বরঞ্চ পুরুষদিগকে সঙ্কুচিত হইয়া পথ চলিতে হয়। দাড়োয়া নদীর তীরে মহিলাদিগের বেড়াইবার অতি রমণীয় স্থান। অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে একটি বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা নদীতীরে দাঁড়াইয়া একটি বালককে ডাকিতেছেন। বালক কোনমতেই উঠিবে না, সে কেবল জল ঘাঁটিতেছে আর অপরাপর বালক-

বালিকাগণের' সহিত উল্লাসে বালি ছড়াইতেছে। তৃণ-শয্যায় বসিয়া কতকগুলি যুবতী কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বালক কোনমতেই তাঁহার কথা শুনিল না দেখিয়া, বৃদ্ধা নিরুপায় হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া কহিলেন "ও শিউলি, দেখ্‌না মা, নসু আমার কথা শুনে না, কেবল জল ঘাঁট্‌ছে।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও বালকের মাতা উঠিয়া আসিল, মাতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বালক খেলা ছাড়িয়া আসিয়া মাতামহীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইল।

এমন সময়ে একখানি বড় জুড়িগাড়ী আসিয়া দাড়োয়া-তীরে দাঁড়াইল। দুইটি সুসজ্জিতা যুবতী ল্যাণ্ডো হইতে অবতরণ করিলেন। বৃদ্ধা একমনে তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, তাহারা যেন তাঁহার চিরপরিচিত, অথচ ভরসা করিয়া তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। নবাগতাদিগের মধ্যে একজনকে দেখিলে হিন্দুরমণী বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাহার সীমন্তে সিন্দুর-রেখা এবং প্রকোষ্ঠে সোণার 'নোয়া' দেখা যাইতেছিল। দ্বিতীয়া উভয়ের মধ্যে অধিক সুন্দরী, যে রূপে নয়ন ঝল্‌সিয়া যায়, তাঁহার সৌন্দর্য্য সেই জাতীয়। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজভুক্তা, মাথায় এলবার্ট সিঁথি, প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত ব্রেস্‌লেট, কোমল চরণদ্বয় গ্লাসি কিডের হাইহিল বুটের মধ্যে বন্দী। পশ্চাৎ হইতে কন্যা ডাকিল "মা," বৃদ্ধার চমক ভাঙ্গিল, তিনি উত্তর দিলেন "যাই"। কার্সটেয়ার্স টাউনের পথে ফিরিতে মাতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে শিউলি, বিবি দুটি দেখিতে বড়-বৌ ও সেজ-বৌএর মত না?" কন্যা উত্তর করিল "বড়-বৌ আর সেজ-বৌই বটে, আমি অনেকক্ষণ চিনেছি, তোমার মনে কষ্ট হবে বলে বলিনি।" বৃদ্ধা

ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ওরে আমার হেমের বৌএর বরাতে এই ছিল ?"

হরবল্লভের পত্নী অনেকদিন কাশীবাস করিয়াছেন, বৎসরান্তে কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র তাঁহাকে দেখিতে আসে। বৃদ্ধা প্রভাতের কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছেন, কন্যা নিকটে বসিয়া আছেন; মাতা বলিতেছেন "ত্যাখ্ শিউলি, এখন আর চোখে ভাল দেখতে পাই না, কোন্‌দিন রাঁধতে রাঁধতে পুড়ে মরব, তুই জামাইকে বলে একটি ভদ্রবংশের ব্রাহ্মণের মেয়ে ঠিক করে দিতে পারিস্ ?" কন্যা স্বামীকে বলিয়া মাতার জন্য পাচিকা ঠিক করিল, যথাসময়ে পাচিকা, রন্ধন করিতে আসিল। পাচিকার প্রথম যৌবন অতীত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় এককালে তাহার রূপ ছিল, কিন্তু সমস্তই যেন জ্বলিয়া গিয়াছে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট আছে। মাতাপুত্রী জানালায় বসিয়া জনস্রোত দেখিতেছিলেন, পাচিকা রন্ধন করিতে করিতে সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। কন্যা বলিতেছে "মা বামুন ঠাক্‌রুণকে যেন কোথায় দেখিয়াছি।" মাতা উত্তর করিলেন "আমারও যেন তাই মনে হয় মা, কিন্তু ভরসা করে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছি না, জীবনে কত লোকই দেখলুম, কত লোকই এলো গেল, বিশ্বেশ্বর কেবল আমায় ভুলে রয়েছেন, কবে যে দয়া কর্ব্বেন তা জানি না।" শেফালিকার সন্দেহ দূর হইল না, সে উঠিয়া গিয়া পাচিকাকে ডাকিয়া আনিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া বৃদ্ধার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল "মা আমি তোমারই বড় বৌ, মুখ পোড়াইয়া কাশীবাস করিতে

আসিয়াছি; আমাকে চরণে ঠাঁই দেও।” মাতা ও পুত্রী পতিতার অশ্রুজলের সহিত অশ্রুধারা মিশাইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন।

*   *   *   *   *   *

ঊষাকাল হইতে বারাণসীর প্রধান প্রধান মন্দিরের পথে শত শত অভাগিনী রমণী ভিক্ষার জন্য বস্ত্রাঞ্চল বিছাইয়া বসিয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাস সবে আরম্ভ হইয়াছে, প্রভাতে বেশ শীত অনুভূত হয়। কেদার-ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া একটি বাঙ্গালী রমণী চীৎকার করিয়া যাত্রীদিগকে উত্যক্ত করিতেছে “ওগো লক্ষ্মী মা, দুটী ভিক্ষে দাও মা, আমার কেউ নাই মা।” কমণ্ডলু ও পুষ্পপাত্র হাতে লইয়া জনৈক বর্ষীয়সী বিধবা কেদার দর্শনে যাইতেছিলেন, তাঁহার পট্টবস্ত্রের অঞ্চল ধরিয়া একটি দ্বাদশবর্ষীয় গৌরবর্ণ বালক তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া রমণী আরও চীৎকার করিতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইলেন, দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার নাম কি মা, বাড়ী কোথায়?” রমণী উত্তর করিল, “মাগো! আমার নাম বামা, আমার বাড়ী ন’দে জেলা, বন্দীপুর, আমার সবই ছিল মা, বরাতের দোষে এমন হ’য়েছে।” বৃদ্ধার পশ্চাতে নন্তু আসিতেছিল, বৃদ্ধা তাহাকে বলিলেন “নন্তু একে একটা টাকা দেও দাদা।” বালক ভিখারিণীকে একটি টাকা দিল, বৃদ্ধার নয়নদ্বয় হইতে দুইটি উষ্ণ বারিবিন্দু পতিত হইল।



"নন্টু, একে একটা টাকা দাও দাদা"—৮২ পৃঃ

টমি

টমি দেখিতে ছোট, কিন্তু আমাদের সংসারে সে একজন কর্ত্তা-ব্যক্তি। আমার এখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাহারা কখনও টমির গায়ে হাত দিতে সাহস করে না। সে গম্ভীরভাবে একখানা পাপোসের উপর বসিয়া থাকে; কেবল আমি এবং আমার স্ত্রী তাহার নিকটে আসিলে লেজটি নাড়িতে থাকে; আর কাহাকেও সে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। সুশী (আমার কন্যা, তাহার ভাল নাম সুশীলা) মাঝে মাঝে তাহার মাতার নিকট নালিস করে যে, টমি কেবল বসিয়া থাকে, খেলা করে না, পথ দিয়া লোক গেলে ডাকে না। তাহার মা তাহাকে বলে যে, টমি অনেক কাজ করিয়াছে, এখন আর পারে না; সে পেন্সন পাইতেছে। টমি কি কাজ করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল মন্দ মন্দ হাস্য করেন।

যখন আমার পিতা পঞ্চসহস্র রজত মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে মিনির পিতার নিকটে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তখন আমি ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া গেলাম। ইচ্ছা ছিল যে কলিকাতায় থাকিয়া হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করি, কিন্তু তাহা হইল না। পাশ করিয়া পিতাকে যখন হাইকোর্টে ওকালতি করিবার বাসনা জানাইলাম, তখন শুনিতে পাইলাম যে তাঁহার অবস্থা ভাল নহে, আমাকে

সুশিক্ষিত করিতে গিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। বরাবর শুনিয়া আসিয়াছি যে, পিতা বিত্তশালী কিন্তু কৃপণ, গ্রামে তাঁহার যে একটু অখ্যাতি আছে তাহাও জানিতাম। আমার বিবাহের পরে যখন বধূ লইয়া বাড়ী আসিলাম তখন আমার পিতা বর-বধূ বরণের পূর্ব্বে বধূর অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ওজন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও শুনিয়াছিলাম। কি করিব, উপায় নাই, দেশে ফিরিলাম।

নিত্য শামলা মাথায় দিয়া কাছারি যাই; শূন্য পকেট ও শূন্য উদর লইয়া ফিরিয়া আসি। পিতার হৃদয়ে দয়ামায়ার স্থান ছিল না। তিনি প্রায়ই আমার উপার্জ্জনের অভাব দেখিয়া জানাইতেন যে তিনি আর আমাদিগের (অর্থাৎ আমার ও আমার স্ত্রীর) ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তখন মনে বড়ই ঘৃণা হইত, ভাবিতাম যেমন করিয়া পারি উপার্জ্জন করিব। তাহার পরদিন শামলাটা মাথায় জোর করিয়া টিপিয়া বসাইয়া আদালতে যাইতাম, দুই এক জন বড় উকীলের মুহুরীর ও দালালের তাড়া খাইয়া স্থির করিতাম এ জঘন্য বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মোট বহির, ওকালতী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা আর হইবে না।

বলা বাহুল্য এ পর্য্যন্ত আমি নিঃসন্তান। মাতা মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিতেন, তাহা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিতাম, ভাবিতাম পিতা ত পুত্রের ব্যয়ভার বহনেই অসমর্থ; পৌত্র-পৌত্রীর আবির্ভাব হইলেই তিনি হয় ত আমাদিগকে বিদায় করিয়া দিবেন। কিন্তু মাতার দুঃখ ক্রমে অভিযোগে পরিণত হইল। পিতা বুঝিলেন তাঁহার পৌত্রাভাবের জন্য বধূই দোষী এবং মাতাও ক্রমশঃ বধূর পক্ষ পরিত্যাগ

করিলেন। বিশেষতঃ পিতা যখন স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, যে তাঁহার পৌত্রহীনতা ভগবানের বিশেষ দয়ার লক্ষণ, কারণ পাঁচটা পাশ-করা ছেলে কোন্ না এখন আর দশ হাজার টাকা আনিবে, তখন আমি বড় বিপদে পড়িলাম।

আমার স্ত্রী যখন পিতার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন তখন তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, মুখখানি ভারও হইল! দুই জনে নীরবে বসিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতাম, প্রবোধ দিতেও ভরসা হইত না। কি বলিয়া প্রবোধ দিব? মাতা যে বধূকে একেবারে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে; তবে দশ হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তবুও গোপনে গোপনে তিনি বধূকে অনেক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন ও অনেক দেবতার পূজা মানিয়াছিলেন। তাহার পর দেবতা বোধ হয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মাতা একদিন সানন্দে পিতাকে আশু পৌত্রমুখ দর্শনের সম্ভাবনার কথা জানাইলেন। আমিও আশু বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম মনে করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। পিতা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

বিধিলিপি কে খণ্ডন করে। যথাসময়ে তিনি মাতার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, মাতা পৌত্রমুখও দর্শন করিলেন; কিন্তু পৌত্র দিবালোক দর্শন করিবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিল,—তিনি মৃতপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। মাতার শোকের ও দুঃখের অবধি রহিল না। কিন্তু পিতা যেন আশ্বস্ত হইলেন। এবং আমার বিনিময়ে (দ্বিতীয়বার) দশ সহস্র রজতখণ্ড অর্জ্জনে এইবার কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অযত্নে ও দুঃখে তিনিও এই সময়ে মৃতপুত্রের অনুসরণ করিবার বিশেষ

চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে আমাদিগের জীবনে টমির প্রথম আবির্ভাব।

টমি ডিপুটি সাহেবের প্রিয় কুক্কুরীর পুত্র এবং তাহার মাতার মনিবের ন্যায় খাস বিলাতী। তাহাকে চারি আনা মূল্য দিয়া মেথরের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া কোটের পকেটের মধ্যে লুকাইয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। ভয়ে ভয়ে তাহাকে বাহির করিলাম। তিনি তখনও রোগ-শয্যায় কিন্তু সে তখনই লেজ নাড়িয়া হাত মুখ চাটিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া লইল, তাহার পর তাঁহার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ছয় মাস কাটিয়া গেল। টমি বড় হইয়া উঠিল। পিতার দশ হাজার টাকা পাইবার আশা যত বলবতী হইয়া উঠিতেছিল, মিনির শরীর ততই অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছিল। অবশেষে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। মিনির পিতা জীবনের শেষ কয়টা দিন দূর পশ্চিমাঞ্চলে কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আমি আর টমি শূন্যগৃহে পড়িয়া রহিলাম। বিপদজাল আমাকে এমনিভাবে ঘিরিয়া ফেলিল যে উদ্ধারের বড় উপায় রহিল না। শুনিতে পাইতেছি যে মিনির রোগ বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না, ভরসায় কুলায় না। দশ হাজার টাকাও বড়ই নিকট হইয়া আসিতেছিল। তখন সমস্ত সঙ্কোচ ও ভয় দূরে ঠেলিয়া আমি মিনিকে দেখিবার জন্য সেই দূর পশ্চিমে রওনা হইয়া পড়িলাম কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলাম কন্যার মৃত্যু হওয়ায় মিনির পিতা সপরিবারে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। বুঝিলাম মিনি মায়া কাটাইয়াছে।

আমি উন্মাদের মত শূন্যহৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম। চোখে এক ফোঁটা জলও ছিল না।

২

মনটা কেমন হইয়া গেল। সকলেরই শুনিয়াছি এমনি হয়। মিনি নাই, বিশ্বাস হয় না। সে যেন কোথায় গিয়াছে, আবার আসিবে। কখনও ভাবিতাম, যদি অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা থাকিত, যদি পিতার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না হইত, তাহা হইলে হয় ত মিনিকে বাঁচাইতে পারিতাম। মাথায় তেল পড়িত না, মলিন বসনে উদাসীনের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মা ভয় পাইয়া পিতাকে বলিতেন, পিতা আশ্বাস দিতেন, ঘরে আবার বৌ আসিলেই সব সারিয়া যাইবে,—অমন হইয়া থাকে।

এক দিন মিনির কথা ভাবিতে ভাবিতে পাগলের মত হইয়াছি, নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে কে আসিয়া বলিল পিতা ডাকিতেছেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম পিতা বড়ই প্রসন্ন, কে যেন আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া গেল, দশ হাজার প্রায় তাঁহার হস্তগত। শুনিলাম কন্যার পিতা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

পিতা বলিলেন, "ভিতরে যাও।" আমি কিন্তু তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিয়া পিতা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভিতরে যাও।"

আমি তবুও নড়িলাম না। কোন কথা কহিলাম না।

পিতা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, বলিলেন, "কি যাবে না?"

পিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতাম। যাঁহার প্রসাদে এই

নশ্বর দেহ লাভ করিয়াছি, কখনও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহি নাই, যখন তিনি তিরস্কার করিতেন, তখন ভাবিতাম তিনি আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই বলিতেছেন। তথাপি দশ সহস্রের জন্য তিনি যখন ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, যখন মনে পড়িল তাঁহারই অযত্নে মিনি আমার মরিয়াছে, তখন ভক্তির স্রোত আর হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে পারিল না।

আমার মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছিল, আমিও উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিলাম "না, যাব না।"

পিতা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, "আমাকে অপমান করবে, তবু যাবে না?"

আমিও উত্তরোত্তর অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলাম, দৃঢ়-কণ্ঠে কহিলাম "না, কিছুতেই যাব না।"

"যাবে না, তবে দূর হও।"

গৃহ হইতে তখনি বাহির হইলাম। অল্প দূর গিয়া বোধ হইল যেন কে আমার পিছনে আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলাম,—টমি—তাঁহার টমি। টমিকে কোলে করিয়া চলিতে লাগিলাম।

কপর্দ্দকশূন্য হইয়া যখন গৃহত্যাগ করিলাম তখন ভবিষ্যতের চিন্তা মনে প্রবেশ করে নাই। আমার কেহ নাই, কিছু নাই, বাঁচিবার আবশ্যক নাই, উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলাম—আমি আর টমি। আমাদের আপনার বলিতে কেহই নাই, আমাদের জন্য চিন্তা করিবার কেহ নাই, একদিনের জন্য আশ্রয় দিবার কেহ নাই; তথাপি গৃহ ত্যাগ করিয়া একটা অপূর্ব্ব শান্তি পাইলাম।

টমি।

যখন অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইয়াছি, তখন অর্থের মুখ দেখিতে পাই নাই, যখন অর্থের অভাবে সংসার মরুময় হইয়া গিয়াছে তখন অর্থ পাই নাই ; কিন্তু যখন অর্থাভাব বোধ করিবার অবস্থা অতীত হইয়াছে তখন ভগবান অর্থ ঢালিয়া দিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া অন্নাভাবে প্রথম উপার্জ্জন করিলাম। একজন কয়লার দালালের কেরাণী হইলাম। দেশে যখন কয়লার দুর্ভিক্ষ হইল তখন আমার মনিব চতুর্গুণ মূল্যে তাঁহার সঞ্চিত কয়লা ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। মনিব ক্রোরপতি হইলেন। তাঁহার প্রসাদে আমার অভাব ঘুচিল। ধনী হইয়া ভাবিলাম অর্থ লইয়া কি করিব? কে ভোগ করিবে? কাহার জন্য উপার্জ্জন করিলাম? ভোগ করিতে কেবল আমি আর টমি।

চাকরী ছাড়িয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলাম, আমি আর টমি। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। গৃহের সংবাদ আমি মাঝে মাঝে পাইতাম। কিন্তু পিতা কখনও আমার সংবাদ লন নাই, একদিনও আমার সন্ধান করেন নাই। আমার আরও দুইটি ভাই ছিল, তাহারা বড় হইয়া উঠিল, তাহাদের বিবাহ হইল, পিতা বোধ হয় আমাকে বিস্মৃত হইলেন। তাহাতে এক দিনের তরেও মনে কোন কষ্ট অনুভব করি নাই। আমি ত মরিয়াছি—আমার আবার অভিমান কি?

পিতা দেহত্যাগ করিলেন, ভাই দুইটি লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর হইল। যে পিতা আমার শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার এমন অর্থ ছিল না যে পুত্রকে কিছুদিন কলিকাতায় রাখিয়া দেন, যাঁহার পুত্রবধূ অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মরিয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহারই

পরিত্যক্ত সম্পত্তি, লইয়া তাঁহার পুত্রগণ দেশের প্রধান ধনী হইয়া পড়িল, ইহাই দেখিয়া মনে একটু দুঃখ হইয়াছিল। ভাই দুইটি প্রথমে ভাবিয়াছিল যে আমি তাহাদের বিষয়-বিভবের ভাগ লইতে আসিব, কিন্তু দুই এক মাস কাটিয়া গেল, ক্রমে দুই এক বৎসর অতীত হইল, তখন তাহারা নিশ্চিন্তমনে বিষয় ভোগ করিতে লাগিল।

কত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কোথাও শান্তি পাইলাম না। আমার মনেই যখন শান্তি নাই তখন কোথায় শান্তি পাইব। টমি আর বেশী বড় হয় নাই, সে যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে।

৩

দেশ ছাড়িয়া আসিবার দশ বৎসর পরে শুনিতে পাইলাম মাতাও পিতার অনুসরণ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আর কখনও জন্মভূমিতে ফিরিব না, কিন্তু তথাপি সময়ে সময়ে মাতার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। ভাবিতাম একবার, কেবল একবার ফিরিব, মাতার পদধূলি লইয়া আসিব, সেই গৃহখানি একবার দেখিয়া আসিব। যে গৃহে জন্মিয়াছি, এ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছি, মিনির সঙ্গে কত সুখদুঃখে যে গৃহখানিতে কাটাইয়াছি, সে গৃহখানি দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। মাকে দেখিবার জন্য একদিন মন সত্যই অস্থির হইয়া উঠিল, কিছুতেই মনকে বাঁধিতে পারিতেছিলাম না। একদিনের জন্যও বাড়ী ফিরিব স্থির করিলাম কিন্তু সংবাদ পাইলাম, মা আর নাই, তিনি পিতার অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্নেহময়ী মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইব না। তখন মনটা যেন কেমনতর হইয়া গেল। যদি কিছুদিন পূর্ব্বে একবার যাইতাম, তাহা হইলেও মাকে দেখিতে পাইতাম!

টমি।

বাঙ্গালা দেশ ত্যাগ করিয়া তখন আমি বহুদূরে বাস করিতেছিলাম। কিন্তু সে দেশ আর ভাল লাগিল না। অনেক দিন বাঙ্গলা দেশ দেখি নাই! তিন দিন রেলে চড়িয়া একদিন সন্ধ্যার সময় মোগলসরাই ষ্টেসনে নামিয়া কাশী আসিয়া পৌছিলাম। বাঙ্গালী-টোলার, একটী ক্ষুদ্র অপরিচ্ছন্ন গৃহে আমরা দুইজন—টমি আর আমি—বাসা লইলাম। তখন পূজার ছুটি, বাঙ্গালীতে কাশী ভরিয়া গিয়াছে। কত দিন পূজার ছুটির কথা শুনি নাই। যখন দেশে ছিলাম পূজার সময় কত উৎসাহ হইত, কত আমোদ করিতাম! কতদিন বাঙ্গালা দেশের দশভুজা দুর্গা প্রতিমা দেখি নাই। শেষ যেবার পূজা দেখিয়াছিলাম, মিনি তখনও বাঁচিয়া ছিল। পিতা বলিয়াছিলেন—থাক্ সে কথা।

কাশীতে আসিয়া মনে হইল যেন দেশে আসিয়াছি। বাঙ্গালী-টোলায় সকলেই বাঙ্গালী। কাশীর হিন্দুস্থানী অধিবাসীরাও সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। বছর বছর পূজার ছুটির সময় শত শত বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে কাশীতে আসিয়া থাকেন। কত বাড়ীতে শারদা-পূজা হইতেছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি নূতন কাপড়জামা পরিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তাহা দেখিলে যে কত আনন্দ হয়, প্রবাসী ব্যতীত কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। যে বহুকাল স্বজাতির মুখ দর্শন করে নাই, বহুকাল মাতৃভাষা শ্রবণ করে নাই, তাহার নিকট এ দৃশ্য—স্বর্গ। আমরা দুইজনে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, পূজা বাড়ীতে গিয়া প্রতিমা দেখিয়া আসি, সন্ধ্যার সময় ঘাটে বসিয়া থাকি, ইহাই আমাদিগের কার্য্য।

আজ মহাষ্টমী। দলে দলে নরনারী অন্নপূর্ণার মন্দিরে চলিয়াছে।

কত লোক আবার অন্নপূর্ণার মন্দির হইয়া দুর্গাবাড়ী যাইতেছে। দশাশ্বমেধ-ঘাটের সিঁড়ির উপরে আমরা দুটিতে বসিয়া তাহাই দেখিতেছি। কত লোক আসিতেছে, স্নান করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। আমাদের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না, একবার জিজ্ঞাসাও করে না। ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি মরি, তাহা হইলে কেবল কাঁদিবে টমি, আর কেহ দেখিয়াও দেখিবে না। এমন কেহ নাই যে, একদিন আর শুশ্রূষা করিবে,—মরণের সময়ে মুখে জল দিবে। টমিও যেন চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল কিন্তু হঠাৎ সে অস্থির হইয়া উঠিল, একটু পরেই উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, কত ডাকিলাম আমার কথা কিন্তু শুনিল না। সে ত পূর্ব্বে কখনও এমন অবাধ্য হয় নাই। মনে করিলাম টমি,—আমার একমাত্র সঙ্গী সেও আজ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

দূরে ঘাটের অপর দিকে কতকগুলি বাঙ্গালী রমণী স্নানান্তে কথা কহিতেছেন। দেখিলাম টমি সেই দিকে ছুটিয়াছে। একটি মহিলার নিকটে গিয়া সে দুই তিনবার ডাকিয়া উঠিল, তাহার পর দুই পা তাঁহার গায়ের উপর তুলিয়া দিল, লেজ নাড়িয়া হাত চাটিয়া সদ্ভাব জানাইল, তাহার পর পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। ছুটিয়া আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া গেল, আবার দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত দিলেন, টমি আনন্দে অধীর হইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। তিনি তাহাকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন, আমি তখন দূর হইতে চীৎকার করিয়া টমিকে ডাকিতেছি। তিনি বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন, কারণ তখনই তাড়াতাড়ি টমিকে নামাইয়া দিলেন। টমি ছোট্টটি বটে, কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। আমার

কুকুর বলিয়া বলিতেছি না, সকলেই এই কথা বলে। তাহাকে আদর করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই—কত লোকই তাহাকে আদর করে; কিন্তু সে ত কখনও আমার নিকট হইতে পলায় নাই। তাহার পর সেই মহিলাটিকে আর দেখিতে পাইলাম না, তিনি জনতার মধ্যে কোথায় মিশিয়া গেলেন তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে টমি ফিরিয়া আসিল। আমি এদিকে চৌষট্টি ঘাট হইতে মানমন্দির পর্য্যন্ত তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সে যখন আসিল, তখন তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তখনও সে বাড়ী ফিরিতে প্রস্তুত নহে। সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চায়। বারবার দৌড়াইয়া যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আসিয়া আমার কাপড় ধরিয়া টানিতেছে। ধমক দিয়া উঠিলে পা চাটিয়া আদর করিতেছে। আমি ভাবিলাম, কে হয় ত তাহাকে মারিয়াছে, না হয় তাড়াইয়া দিয়াছে; সেই জন্য সে নালিশ করিতে আসিয়াছে। সে সময়ে সময়ে এমন নালিশ করিত। তখন বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছে, ক্ষুধার উদ্রেক হইতেছে, তাহার আব্দার আর ভাল লাগিতেছিল না।

সে মূক। সে যাহা খুঁজিয়া পাইয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতে আসিয়াছিল। আমি ত তাহা বুঝিতে পারি নাই। সে তাহার ভাষায় আমাকে জানাইতে আসিয়াছিল যে, এ জগতে তাহাকে ভালবাসে এবং ভালবাসিত এমন একজনের সন্ধান পাইয়া, সে আমাকে জানাইতে আসিয়াছিল। তাহার সুদূর শৈশবে যে তাহাকে মাতার ন্যায় পালন করিয়াছিল, সে তাহার অপূর্ব্ব ঘ্রাণশক্তিবলে তাহাকে আবিষ্কার

করিয়া আমাকে জানাইতে আসিয়াছিল। সে বুঝিত যে এ বিশাল জগতে তাহার আমি, এবং আমার সে ব্যতীত আর কেহই নাই। আর এক জন ছিল, কিন্তু আজ পঞ্চদশ বর্ষ সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার অভাব বোধ করিত, বেদনা অনুভব করিত, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারিত না।

টমিকে কোলে করিয়া গৃহে ফিরিলাম। সে কিছুতেই ফিরিবে না, কেবল পলাইয়া যাইবে। অগত্যা তাহাকে বহিয়া লইয়া আসিলাম। আহার শেষ হইয়াছে, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, টমি পলাইয়াছে। তখনই তাহাকে সন্ধান করিতে বাহির হইলাম। কেদারঘাট হইতে মনিকর্ণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ী ও গলি খুঁজিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর তখন তাহাকে পাইলাম। সে যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, সে পলাইয়া আসিয়া ঘ্রাণশক্তির বলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। তাহার পর সংবাদ দিবার জন্য আমার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। টমি আমাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল, আবার আমার কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার খানিক দূর দৌড়িয়া গেল। তখন আমি কতকটা বিস্ময়ে কতকটা কৌতূহলে তাহার অনুসরণ করিলাম।

গলির ভিতরে একখানি নূতন বাড়ী। তাহার সম্মুখে পাথরের একটি ক্ষুদ্র মন্দির। টমি তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। আবার তখনই বাহির হইয়া আমার নিকট আসিল। আমি তাহাকে ধরিতে গেলাম, সে পলাইয়া গেল। আমি স্তম্ভিত হইয়া মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মন্দির মধ্যে একটি শ্বেত প্রস্তরের শিবলিঙ্গ, তাহার সম্মুখে পূজা-নিরতা বিধবাবেশ-ধারিণী রমণী। টমি ঝাঁপাইয়া রমণীর ক্রোড়ে উঠিয়াছে। তাঁহার হস্তের অর্ঘ্য পড়িয়া গিয়াছে, টমির পদাঘাতে পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, নৈবেদ্য ভূমিতে গড়াইতেছে। রমণী টমিকে কোলে করিয়া পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া আছেন।

পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। স্তম্ভিত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমার যেন মনে হইল, তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। দূরে, বহুদূরে তাঁহার মত কাহার অস্পষ্টমূর্ত্তি আমার স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। কে সে রমণী? তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছি? তাঁহাকে দেখিয়া আমার শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যেন বিজলী খেলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি মনে করিতে পারিতেছি না। এইরূপ মুখশ্রী আর একবার যেন তাহার মত কাহাকেও দেখিয়াছি।

বাসর-সজ্জায় নিশীথ রাত্রিতে উৎসব-কোলাহল-মুখরিত-গৃহে চন্দন-চর্চ্চিত একখানি মুখের মতন। কিন্তু সে ত নাই, বহুদিন পূর্ব্বে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। অথচ তাহারই মতন—সে যেন রোগশয্যায়—তখন তাহার দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল—এ অনশনক্লিষ্ট দেবীমূর্ত্তি বিধবার সজ্জায় তাহারই মত দেখিতে। টমি কি তাঁহাকে ভাবিয়াই এখানে আসিয়াছে। না,—এ নয়ন-যুগলে সেই পুরাতনভাব যেন সত্যই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। ইনি যেন আমার চির-পরিচিত—কতদিন যেন ইঁহাকে দেখিয়াছি।

রমণী ধীরে ধীরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আপনি"—বলিয়া থামিয়া গেলাম; হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তুমি—তুমি কে?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া রমণী মূর্ত্তি কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর নাই।

আমি উন্মাদের মত জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম, "তুমি—তুমি কি মিনি?"

রমণীমূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন! টমি তখনও তাঁহার কোলে। আমার পায়ের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো আমি তোমারই সেই মিনি, তোমারই সুখের জন্য আমি—" তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। মূর্চ্ছিত হইয়া সেই মন্দির-দ্বারে আমার পদতলে পড়িয়া গেলেন।

বিজয়া

ইচ্ছামতীর তীরে একটী ক্ষুদ্র কুটিরে জয়চাঁদ বাস করিত। আম ও কাঁঠাল গাছের ছায়ায় তাহার ঠাকুরদাদা এই ঘরখানি বাঁধিয়াছিল। নদীতীরে বাস করিলে সময় বুঝিয়া জাল বাহিতে বাহির হওয়া যায়, নৌকাখানির উপরে সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে—এইরূপ নানা রকম সুবিধা বুঝিয়া জয়চাঁদের পূর্ব্বপুরুষ গ্রাম হইতে দূরে ঘর বাঁধিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে আম ও কাঁঠাল গাছের উপরে বৃহৎ জাল শুকাইতে দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিত যে ইহা মৎস্যজীবীর গৃহ। এই গৃহে বিধবা কন্যাকে লইয়া জয়চাঁদ একা বাস করিত।

সে তখন বৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ষাট বৎসর বয়সে তাহার সুদীর্ঘ সবল দেহ দেখিলে সকলেই বিস্মিত হইয়া যাইত। যৌবনে সে নৌকা লইয়া দেশে বিদেশে যাইত, রেলপথে দেশ ছাইয়া যাইবার পূর্ব্বে সে কতবার যাত্রী লইয়া গঙ্গা-সাগরে গিয়াছে, দুস্তর ঢোল-সমুদ্র পার হইয়া সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে মহামারিতে স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া জয়চাঁদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর সে প্রায়ই বিদেশে যাইত না,—বৎসরে দুই একবার মাত্র গ্রামে প্রবেশ করিত। সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মাছ ধরিত, প্রভাতে তাহার কন্যা গ্রামে গিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আসিত। বৃদ্ধ জাল বুনিয়া এবং ঘুমাইয়া সমস্ত দিন

কাটাইয়া দিত। পুরুষোত্তম বা গঙ্গাসাগর-যাত্রার নাম হইলে গ্রামের বৃদ্ধবৃদ্ধাগণ এখনও জয়চাঁদের নাম স্মরণ করেন, ঝড়তুফানে তাহার অসমসাহসিকতার কথা বর্ণনা করেন। যাহারা রেলপথে বা ষ্টিমারে তীর্থে যাইত, তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া সেকালের পথের বিপদের কথা শুনিত।

স্বজাতির রীতি অনুসারে জয়চাঁদ সাতবৎসর বয়সের সময়ই কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। তাহার জামাতার বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসর। কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে বিজয়া বিধবা হইয়াছিল, বিবাহের পরে তাহাকে কখনও শ্বশুর গৃহে যাইতে হয় নাই, সে আজীবন পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিল। বিজয়া সুন্দরী; কৈবর্ত্তের গৃহে এত রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, জয়চাঁদের গৃহে সত্য সত্যই গোময়ে প্রফুল্ল কমল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সে যখন মাছের ডালা মাথায় করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া যাইত, গ্রাম্য যুবকগণ স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত, কিন্তু তাহার গম্ভীর স্বভাবের জন্য এবং পিতার ভয়ে কেহ কখনও তাহাকে কোন অন্যায় কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। কেহ কেহ বলিত এতরূপ কৈবর্ত্তের গৃহে সম্ভব নহে, জয়চাঁদ বোধ হয় বিদেশে মেয়েটিকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল।

২

গ্রামে বড়ই ধূম, শারদা পূজার দিন উপস্থিত। যে সকল গ্রামে অনেকগুলি প্রতিমা হইয়া থাকে, সে সকল গ্রামের লোক পূজার ধূমধাম ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে সকল গ্রামে দুই এক খানির বেশী প্রতিমা আসে না, তাহারাই বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসবের প্রকৃত আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। লাভপুর গ্রামে একখানি মাত্র

পূজা হইয়া থাকে, গ্রামের জমিদার-বংশ ব্যতীত আর কাহারও দুর্গাপূজা করিবার মত অবস্থা নহে। সেই জন্যই গ্রামশুদ্ধ লোক চৌধুরী বাড়ীর পূজায় মাতিয়া যায়। পূজার কয়দিন দিনের বেলায় চৌধুরী বাড়ী ছাড়া অন্য কোন অংশে প্রায় লোক দেখা যায় না।

কয়দিন বৃষ্টি না হওয়ায় বড়ই গরম পড়িয়াছে, বৃদ্ধ জয়চাঁদ আমগাছের ছায়ায় বসিয়া একখানা বেড়জাল বুনিতেছে, বিজয়া ঘরের দাওয়ায় আঁচল পাতিয়া শুইয়া আছে। তৃতীয় প্রহরে রৌদ্রের তেজ বাড়িয়া উঠিতেছে, বুড়া জাল বুনিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। মাঝে মাঝে নীল আকাশে ছোট ছোট সাদা মেঘ দেখা যাইতেছে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহারা ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। দূরে গ্রাম হইতে নহবতের শব্দ আসিতেছে, সময়ে সময়ে পূজা-বাড়ীর ঢাকঢোলের বাজনার শব্দ শোনা যাইতেছে। এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল—"জয়চাঁদ বাড়ী আছ?" বুড়া ব্যস্ত হইয়া সূতা ফেলিয়া উঠিল, বাহিরে আসিয়া দেখিল একটি সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক দাঁড়াইয়া আছে। বুড়া দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। যুবকের বয়স আন্দাজ সতর আঠার, বেশভূষা পল্লীগ্রামবাসীর ন্যায় নহে; দেখিলে কলিকাতার লোক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যুবক সেই গ্রামের অধিবাসী, জমিদার বদনচন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করেন, সেইজন্য হাবভাব কলিকাতা-বাসীর ন্যায় হইয়া গিয়াছে। বুড়া প্রণাম করিয়া হাত যোড় করিয়া—বলিল "হুকুম!" যুবক হাসিয়া বলিল,— "জয়চাঁদ, বিজয়ার দিন একখানা বাচের নৌকা চাই; কলিকাতা হইতে আমার কয়েকজন বন্ধু আসিয়াছেন, তাঁহাদের বাচ-খেলা দেখাইতে

হইবে। বুড়া হাসিয়া উত্তর করিল, "তাহার জন্য আর চিন্তা কি বাবু? আমি কালই ছিপ্ ঠিক্ করিয়া আসিব।"

যুবক। আজ গেলে হোত না?

বৃদ্ধ। না বাবু, আজকের দিনটা মাপ করুন, কাল সকালে আপনার বাড়ী দুই মণ মাছ দিতে হইবে। মাছ কম হইলে কর্ত্তাবাবু পিঠের চামড়া রাখিবেন না।

যুবক। তবে তুমি কালই যেও।

বৃদ্ধ। ছোট বাবু, যদি এতদিন বাদে এলেন তো আমার ভিটেয় একবার পায়ের ধূলা দেবেন না?

যুবক ফিরিতেছিল, বৃদ্ধের অনুরোধে তাহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বুড়া বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, "বিজয়া, ছোটবাবু আসিয়াছেন একখানা চৌকি বাহির করিয়া দে।" বিজয়া শুইয়াছিল। পিতার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের ভিতর গেল। একখানা ছোট জলচৌকি বাহির করিয়া উঠানে রাখিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া যুবককে প্রণাম করিল। যুবক বসিল, জয়চাঁদও বসিল। এমন সময় বাহির হইতে বামাকণ্ঠস্বরে কে বলিয়া উঠিল,—"কিশোরী, অন্ধকারে কোথা গেলে বাবা। আমাদের যে জোঁকে খেয়ে ফেল্লে।" কিশোরী হাসিয়া উঠিল, বলিল,—"জয়চাঁদ, আমি আজ আসি। আমার বন্ধুরা সব কলিকাতার লোক তাহারা বেশিক্ষণ ইছামতির ধারে বেড়াইলে মরিয়া যাইবে। বুড়া হাসিয়া বলিল,—"আহা, বাবুরা সুখী মানুষ, কষ্ট করা তো অভ্যাস নাই। তাঁরাও একটু বসুন না কেন? বিজয়া, আরও দুইখানা চৌকি বাহির করিয়া দে।" কিশোরী তখন বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া

ডাকিল,—"ওহে সুরেন বাবু, একবার এই দিকে এস। নিকট হইতে উত্তর আসিল,—"এই দিক্‌টা কোন্‌দিক্‌ বাবা, তা ত' বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান যে শেয়ালদা ষ্টেসনে রেখে এসেছি।" জয়চাঁদ বলিল,—"আমি বাবুদের নিয়ে আস্‌চি।" তাহার পরক্ষণেই বুড়ার পিছনেই দুইটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। কলিকাতাবাসিগণ সেইরূপ শত শত মূর্ত্তি নিত্য দেখিয়া থাকেন, কিন্তু পল্লীগ্রামে তাঁহাদিগের দর্শন দুর্ল্লভ। তাঁহাদিগের পরণে অত্যন্ত মিহি দেশী ধুতি, তাহার কোঁচা কাদায় লুটাইয়া অপরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, গায়ে মিহি আদ্ধির পাঞ্জাবী, তাহার ভিতর হইতে গেঞ্জির গোলাপী রং ফুটিয়া বাহির হইতেছে, পায়ে রেশমের রঙ্গিন মোজা ও কাল বার্ণিস করা পম্‌প্‌সু, তাহাতে এত কাদা জমিয়াছে যে চিনিতে পারা কঠিন। অঙ্গে জরির পাড় ঢাকাই উড়ানী—অধিকাংশ পিছনদিক হইতে কাদায় লুটাইতেছে; তাহা ছাড়া প্রত্যেকের হাতে সৌখীন ছড়ি ও অঙ্গে এসেন্স-সৌরভ। এহেন মূর্ত্তি পল্লীগ্রামে বড়ই দুর্লভ, সেই জন্যই "কলিকাতার বাবু" দেখিতে একপাল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অস্থিচর্ম্মসার লম্বোদর বালক তাহাদিগের সঙ্গ লইয়াছে। বাবুদ্বয় গৃহে প্রবেশ করিয়াই নাকে রুমাল দিলেন ও বলিলেন,—"কিসের গন্ধ হে?" জয়চাঁদ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল,—"বাবু আমরা জাতিতে জেলে, গাছের উপরে জাল শুকাইতে দিয়াছি, তাহারই গন্ধ বাহির হইয়াছে।" দ্বিতীয় বাবুটি লোলুপ নেত্রে বিজয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। বিজয়া নূতন লোক দেখিয়া সরিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পল্লীসুলভ চপলতা-বশতঃ ঘোমটার ভিতর হইতে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। সুরেন্দ্রবাবু এতক্ষণ তাহাকে দেখিতে পান নাই, দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"উঃ!"

তাঁহার সঙ্গী মৃদুস্বরে বলিলেন,—"গোবরে পদ্মফুল।" জয়চাঁদ তাহা শুনিতে পাইল না, কিশোরীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল—"ওহে, তোমাদের এখানে থাকিয়া কাজ নাই, এখনই জালের গন্ধে মাথা ধরিবে।" সকলেই উঠিলেন। তাহাদিগের চাহনির ভাব দেখিয়া বিজয়া পূর্ব্বেই ঘরের ভিতরে পলায়ন করিয়াছিল।

৩

আজ নবমী। জয়চাঁদ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাছ ধরিতে গিয়াছে। গ্রামের অনতিদূরে চারি পাঁচটি নদী একত্র মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হইয়াছে; গ্রাম্যভাষায় ইহার নাম "বাঁওড়"। এখন নদী-নালা শুকাইয়া গিয়াছে, বর্ষাকালেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল হয় না, মৎস্যকুল ত নির্ব্বংশ হইতে চলিয়াছে। সেই জন্যই অধিক মৎস্য প্রয়োজন হইলে ধীবরেরা "বাঁওড়ে" জাল ফেলিতে আসে। জয়চাঁদ জমিদার-বাড়ী মৎস্য আনিবার জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নৌকা লইয়া বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় বিজয়াকে বলিয়া গেল,—"ওরে আমি বাঁওড়ে যাচ্ছি, ভোরের বেলায় ফিরিব।"

শরতের নির্ম্মল জ্যোৎস্না যখন রজতধারায় চারিদিক শুভ্র করিয়া তুলিল, তখন গ্রামের কোলাহল নিবৃত্তি হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সন্ধিপূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, পূজাবাড়ী ছাড়িয়া দলে দলে নরনারী গৃহে ফিরিয়াছে। কাজের জন্য বিজয়া সেদিন আর ঠাকুর দেখিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল, সন্ধ্যার পরে ভিড় কমিলে যাইবে! কিন্তু যাই যাই করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। প্রথম প্রহরের শেষে একটু বাতাস উঠিল, কয়দিন হইতে তাহার মন খারাপ হইয়াছিল, হাওয়া দেখিয়া ভয় পাইল।

রন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পিতার কথা ভাবিতে লাগিল। "বাঁওড়" সমুদ্র বিশেষ, একপার হইতে অপরপারে পাড়ি জমাইতে হইলে এক প্রহর কাটিয়া যায়, ঝড়ের সময়ে "বাঁওড়ে" নৌকার ভারি বিপদ্। তাহার বৃদ্ধ পিতা ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া একা "বাঁওড়ে" গিয়াছে, ভালয় ভালয় ফিরিলে সে পাঁচ পয়সার 'হরির লুট' দিবে, ঠাকুরের নিকট বার বার এই কামনা করিতেছিল।

যেখানে ঘরের ছায়া পড়িয়া অন্ধকার হইয়াছিল, সেইখানে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল, বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিল না, সে তখন আপনার ভাবনা লইয়াই ব্যস্ত ছিল। নিঃশব্দে দুইজন লোক দাওয়ার উপরে উঠিল; বিজয়া তাহাও দেখিতে পাইল না, সে তখন একমনে পিতার উদ্ধারের জন্য নারায়ণকে ডাকিতেছিল। পশ্চিমে একখানা ঘন কাল মেঘ জ্যোৎস্নার আলোকে আরও কালো দেখাইতেছিল, সে তাহা দেখিয়া ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। লোক দুইটি পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিল, বিজয়া তাহা জানিতে পারিল না। একজন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি কাপড় দিয়া তাহার মুখ ও হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল, বিজয়া চীৎকার করিবারও অবসর পাইল না। চীৎকার করিলেও কোন ফল হইত না, তাহাদিগের বাড়ীর নিকটে জনমানবের বসতি ছিল না, গ্রাম সেখান হইতে অনেক দূরে। লোক দুইটি তাহাকে কাঁধে করিয়া বাহির হইল।

মেঘে তখন আকাশ ছাইয়া গিয়াছিল, চাঁদ ঢাকিয়া গিয়াছিল, সুতরাং জ্যোৎস্নাও নিবিয়া গিয়াছিল। তথাপি তাহারা বিজয়াকে লইয়া পথ

ছাড়িয়া বন পথে প্রবেশ করিল এবং আম ও কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ছায়ায় গ্রামের বিপরীত দিকে চলিয়া গেল।

হ্রদের প্রশান্ত বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা কৌমুদী লইয়া খেলা করিতেছিল, তখনও মেঘ দেখা দেয় নাই। ডিঙ্গিতে বসিয়া জয়চাঁদ একমনে তাহাই ভাবিতে ছিল, আর মাঝে মাঝে দাঁড় বাহিয়া মৃদু গতিতে নৌকা চালাইতেছিল। পশ্চিমে ধীরে ধীরে যে মেঘখানা উঠিতেছিল, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বাতাস উঠিতে তাহার চৈতন্য হইল। অনেক কষ্টে প্রায় পঞ্চাশ টাকার সূতা খরচ করিয়া জয়চাঁদ একখানি বেড়জাল বুনিয়াছিল, আজ সে সেইখানা লইয়া আসিয়াছে। বেড়জাল লইয়া মাছধরা একজনের দুঃসাধ্য, কিন্তু তাহার জালখানা ছোট বলিয়া এবং লোকেরও অত্যন্ত অভাব বলিয়া সে একাই জাল লইয়া আসিয়াছিল।

বাতাস কমিল না, বরং উত্তরোত্তর হাওয়ার জোর বাড়িতে লাগিল দেখিয়া বুড়া মনে মনে খুব বিরক্ত হইল। এমন সময়ে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া নৌকাখানাকে ঘুরাইয়া দিয়া গেল; বুড়া তখন ব্যস্ত হইয়া জাল গুটাইতে বসিল। দেখিতে দেখিতে মেঘ বাড়িয়া উঠিল, চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; বৃদ্ধের নৌকা তখনও "বাঁওড়ের" মাঝখানে। তাহাতে জয়চাঁদ ভয় পায় নাই, জীবনে সে অনেক ঝড় দেখিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ভীষণ ঝড় হইতে নৌকা বাঁচাইয়া আসিয়াছে;—তাহার ভাবনা হইতেছিল জাল খানার জন্য। সে ভাবিতেছিল জালখানা কোন রকমে তুলিতে পারিলে সে ডিঙ্গি লইয়া তীরের মত ছুটিয়া যাইবে এবং কোন না কোন নদীর মোহানায় আশ্রয় লইবে। কিন্তু তখন সে বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার দেহে আর তত বল নাই,

জাল তুলিতে তুলিতে ভীষণ ঝড় উঠিল, নৌকা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। জাল উঠাইয়া যখন সে নৌকা বাহিতে আরম্ভ করিল তখন চারিদিক্ হইতে দম্‌কা বাতাস আসিয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গিখানিকে অস্থির করিয়া তুলিল। ডিঙ্গি তখন আর বৈঠা মানিতে চাহে না, মাঝে মাঝে ঝড়ের মুখে ডিঙ্গিখানি তীরের মত ছুটিয়া যায়, আবার কোথা হইতে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া ডিঙ্গিখানিকে ঘুরাইয়া দেয়। অনেকক্ষণ পরে জয়চাঁদ বুঝিতে পারিল, ডিঙ্গি কোন নদীর মুখে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পশ্চাতে পর্ব্বতের মত উন্মত্ত তরঙ্গরাশি ছুটিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু কূলে আঘাত লাগিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, ডিঙ্গির আর কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

৪

গ্রাম হইতে একক্রোশ দূরে চৌধুরী মহাশয় একখানি বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে ফুলের গাছই অধিক, বহুমূল্য আমের কলমও ছিল, কিন্তু সেগুলি তখনও বড় হয় নাই, কিশোরীর পিতা এই বাগানে একখানি ঘর তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং কখনও কখনও গ্রীষ্মকালে সেইখানে বাস করিতেন। ঝড়ের রাত্রিতে বাগানের ঘরের ভিতরে একটি আলোক দেখা যাইতেছিল, চারিদিকের দরজা-জানালা বন্ধ, ঘরের বারান্দায় দুইজন নীচজাতীয় লোক বসিয়াছিল। তখন প্রবল বেগে ঝড় বহিতেছে, তাহার সহিত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন ঝড় বাঙ্গালা দেশে অনেকদিন হয় নাই। ঘরের ভিতরে চারিটী মানুষ ছিল, তাহাদিগের মধ্যে তিন জন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি বিজয়া, তাহার হাত পা বাঁধা, কিন্তু মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিজয়া কোন কথা

কহিতেছে না, কেবল মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। পুরুষ তিনজনের মধ্যে দুইজন আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত, একজন নূতন। সে দুয়ারের নিকট বসিয়া তামাক সাজিতেছিল।

কিশোরী চৌধুরী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। চৌধুরী মহাশয় বাল্যকালে কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছিলেন, তিনি রিচার্ডসন সাহেবের ছাত্র। সেক্সপীয়ারের নাটকগুলি আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন, তাঁহার ধারণা ছিল যে কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও প্রকৃত শিক্ষা হয় না। কিশোরী যখন বড় হইয়া উঠিল, তখন স্কুল কলেজে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও,আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চৌধুরী মহাশয় তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিশোরী কলিকাতায় আসিল, কিন্তু সুশিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষায় মনঃসংযোগ করিল। সে ধনীর সন্তানের ন্যায় বাস করিত, কলিকাতার ধনী সম্প্রদায়ের সন্তানগণের সহিত মিশিত, শিক্ষিত সমাজের দিকে কোন কালেই আকৃষ্ট হয় নাই। দলে পড়িয়া সে অল্প বয়সেই মদ্যপান করিতে শিখিয়াছিল, কুস্থানেও যে যাইত না তাহা নহে।

একমাত্র পুত্র বলিয়া চৌধুরী মহাশয় তাহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়াও কোন কথা বলিতেন না। কিশোরী কলিকাতায় থাকিয়া মাসে দুই তিন শত টাকা ব্যয় করিত। পূজার সময় কিশোরী তাহার দুই তিন জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গ্রামে আনিয়াছিল, ইহারা তাহার নিত্য সহচর,—কলিকাতার কোন বিখ্যাত বংশজাত হইলেও অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। দুয়ারের কাছে বসিয়া যে তামাক সাজিতেছিল, সেই কিশোরীর অধঃপতনের মূল। কিশোরী যখন প্রথম কলিকাতায় যায়, তখন চৌধুরী মহাশয় তাহার সঙ্গে

একজন বালকভৃত্য দিয়াছিলেন। নিতাই পিতৃমাতৃহীন, আশৈশব চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে পালিত। কলিকাতায় গিয়া, মনিবের ন্যায়, সেও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সেই কিশোরীর গতিবিধি গোপন করিয়া রাখিত, কিশোরীকে এমন সাবধান করিয়া চলিত যে, চৌধুরী মহাশয় কোন কথাই জানিতে পারিতেন না। নিতাই আর একজন পাইকের সহিত বিজয়াকে ধরিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু কিশোরী তাহা জানিত না। নিতাই বলিতেছিল,—"দাদাবাবুর মনটা এখনও নরম আছে, তিনি জেগে থাক্‌লে আমাকে যেতে দিতেন না।" তাহা শুনিয়া একজন বলিলেন, "কিরণ, মেয়েটাকে ছেড়ে দে, কিশোরী শুন্‌লে কি মনে ক'র্‌বে।"

কিরণ। দেখ্‌ সুরেন, তোর মনে যদি এত ধর্ম্মভাব থাকে ত আমাদের সঙ্গে মিশিস্‌ নি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন উত্তর না দিয়া বিজয়ার বাঁধন খুলিয়া দিল। সে গায়ের কাপড় সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রথম ব্যক্তি মদ্যপান করিতে-ছিল; সে তাড়াতাড়ি গেলাস রাখিয়া বলিয়া উঠিল,—"দেখ্‌ কিরণ, ন্যাকামি করিস্‌ নি।" নিতাই হাসিয়া বলিয়া উঠিল—"ও যাবে কোথায় বাবু, আমি দোর আগলে বসে আছি।" বিজয়া ভরসা পাইয়া চুপ করিয়া ছিল, তাহার কথা শুনিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিরণবাবু কি বলিতেছিলেন, এমন সময় একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া ঘরখানিকে কাঁপাইয়া তুলিল, বাহিরে একটা ভীষণ শব্দ হইল, তাহার সঙ্গে লোক দুইজন চীৎকার করিয়া উঠিল। নিতাই তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল, সুরেনবাবুও তাহার পিছনে পিছনে দেখিতে গেলেন। বিজয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিরণ তাড়াতাড়ি তাহার

হাত চাপিয়া ধরিল, বাতাসে আলো নিবিয়া গেল। বিজয়া দুই একবার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোথা হইতে হঠাৎ তাহার দেহে অমানুষী শক্তির আবির্ভাব হইল, সে সজোরে কিরণের বুকে একটা লাথি মারিল। সে তখন মাতাল হইয়াছিল, পড়িয়া গেল। বিজয়া মুক্তি পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

৫

বিজয়া গৃহে ফিরিল না, ভাবিল একা পাইলে নিতাই আবার ধরিয়া লইয়া যাইবে, কোমরে কাপড় জড়াইয়া নদীতীরের দিকে ছুটিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঝড়ের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বিজয়া জ্ঞান-শূন্যা হইয়া ছুটিতেছিল, বেতের কাঁটায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল। সে বাধা পাইয়া দুই তিনবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু উঠিয়া আবার ছুটিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল যে, নিতাই তাহার পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে।

বিজয়া নদীতীরে একবার দাঁড়াইল। ঝড়ে ক্ষুদ্র নদীবক্ষ আলোড়িত হইতেছিল। বিজয়া ভাবিল বুঝি নৌকা আসিতেছে, আকুলকণ্ঠে ডাকিল "বাবা!" ঝড়ের শব্দে তাহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। নিকটে একটা গাছ পড়িল। তাহার শব্দ শুনিয়া বিজয়া চমকাইয়া উঠিয়া ভাবিল, নিতাই আসিতেছে। সে আবার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যা হইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ইছামতী আঁকিয়া বাঁকিয়া "বাঁওড়ের" দিকে অগ্রসর হইয়াছে, স্থানে স্থানে জল শুকাইয়া নদীগর্ভ বালুকাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে নদীর উভয়তটে গভীর বন। নদীতীর

ধরিয়া একক্রোশ পথ চলিলে তবে "বাঁওড়ে" উপস্থিত হওয়া যায়। বিজয়া সেই পথেই ছুটিতেছিল।

সে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, দেখিল সম্মুখে বিশাল উর্ম্মিরাশি ভীষণবেগে তটভূমি আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহাদিগের গভীর শব্দ ঝড়ের বিপুল গর্জ্জন ডুবাইয়া দিতেছে। সম্মুখে "বাঁওড়"। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল যে তাহার পিতা নিশ্চয়ই "বাঁওড়ে"র কোন না কোনও স্থানে আছে, তখন তাহার মনে সাহস হইল, সে চীৎকার করিয়া ডাকিল "বাবা!" তরঙ্গের পর তরঙ্গ, প্রবল বাত্যার তাড়নে তীরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, প্রতিঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে শত শত বজ্রনাদের সৃষ্টি হইতেছিল, তাহা ভেদ করিয়া উঠিবার শক্তি রমণীর কণ্ঠে নাই। বিজয়া আবার ডাকিল "বাবা!" কে উত্তর দিবে? তরঙ্গের আঘাতে তীরের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিজয়া ভাবিল কে আসিতেছে। সে যেমন অগ্রসর হইতে যাইবে অমনই গগন বিদীর্ণ হইয়া বজ্রশিখার উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বিজয়া বিস্মিতা হইয়া দেখিল, সম্মুখে একটা শ্বেতবর্ণ জন্তু দাঁড়াইয়া আছে। সে অনেক সহ্য করিয়াছিল—আর পারিল না, বজ্রশিখা নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর। বিজয়া যেখানে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, তাহার অনতিদূরে একটা কাণানদীর মোহানায় জয়চাঁদ ডিঙ্গি লইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বে ইচ্ছামতী নদী সেই খাদে প্রবাহিতা হইত, নদীর গতি এখন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহা বিলে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্য লোকে পুরাতন খাদকে কাণানদী বলিত।

বিজয়া "বাঁওড়ের" তীরে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একপার্শ্বে ইচ্ছামতী ও অপর পার্শ্বে কাণানদী। বিজয়া যখন তীরে দাঁড়াইয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়াছিল, তখন জয়চাঁদ ডিঙ্গিতে বসিয়া ভিজিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল বিজয়া যেন তাহাকে ডাকিতেছে। জয়চাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মনে হইল বিজয়া যেন আবার তাহাকে ডাকিল। সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল যে কে "বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে, কিন্তু ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর বজ্র-নির্ঘোষে মিলাইয়া গেল, জয়চাঁদ মনে মনে হাসিল—ভাবিল, তাহাকে শমনের গ্রাস হইতে পলাইতে দেখিয়া প্রেতযোনিসমূহ প্রলোভন দেখাইতেছে। তাহাকে কোনমতে আবার বাত্যাবিক্ষুব্ধ উন্মত্ত বীচিমালার মধ্যে লইয়া যাইতে চাহে, তরঙ্গাঘাতে তাহার ক্ষুদ্র নৌকাখানি তটভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিতে চাহে। বদ্ধমূল সংস্কার অনুসারে বৃদ্ধ রাম নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

শেষ রাত্রিতে ঝড় কমিয়া আসিতে লাগিল, বৃদ্ধ কাণানদী হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছামতীতে পড়িল, ধীরে ধীরে নৌকা বাহিয়া গ্রামের অভিমুখে চলিল। বহুকষ্টে নৌকাখানিকে তীরে টানিয়া জয়চাঁদ গৃহে তুলিল, দুয়ারে দাঁড়াইয়া কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না, দেখিয়া আশঙ্কায় বৃদ্ধের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। দুয়ারে হাত দিয়া দেখিল দুয়ার খোলা। বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়া দুই তিনবার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিল, কেহ উত্তর দিল না, দেখিয়া বৃদ্ধ চকমকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করিল, তাহার পর প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহের চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ তাহার কি মনে হইল, সে কাপড় ছাড়িল, ঘরের চাল হইতে একখানা দীর্ঘ

ছোরা বাহির করিল, তাহা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পূজাবাড়ী নিস্তব্ধ। পরিশ্রান্ত হইয়া যে যেখানে স্থান পাইয়াছে, সে সেইখানে শয়ন করিয়াছে। ঝড়ে আলোগুলি নিবিয়া গিয়াছে। তখনও বাতাস বহিতেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে। দুয়ারে কেহই নাই, পূজার দালানে কতকগুলা কুকুর আশ্রয় লইয়াছে।

একজন লোক কাপড় মুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে পূজা বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তাহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। লোকটি সদর দরজা পার হইয়া গেল, বৈঠক খানার ভিতরে প্রবেশ করিল। বারান্দায় কেহই ছিল না, বৃষ্টির ভয়ে ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, লোকটি একটি একটি করিয়া সকল ঘরে প্রবেশ করিল, আবার বাহির হইয়া আসিল, তাহার পরে বৈঠকখানা পরিত্যাগ করিয়া অন্দরের দিকে চলিল।

পূজার দালানের সংলগ্ন একটি ঘরে কিশোরী বসিত, লোকটি সেই ঘরে প্রবেশ করিল, দেখিল বিছানার উপরে কে একজন শুইয়া আছে, আর ঘরের কোণে মিটমিট করিয়া একটা হরিকেন জ্বলিতেছে। সে ব্যক্তি আলোটি উঠাইয়া লইয়া নিদ্রিতের মুখের নিকট ধরিল, সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল "এত ভোরে আমি উঠিতে পারিব না।" এই বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল,—সে ব্যক্তি কিশোরী। নবাগত ব্যক্তি গায়ের কাপড় খুলিয়া কোমরে বাঁধিল, তাহার পর ছোরা-খানি হাতে লইয়া ফিরিয়া গেল, তাহার পর কিশোরীর ঘাড় ধরিয়া জোরে একটা ধাক্কা দিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, দেখিল সম্মুখে জয়চাঁদ, তাহার মূর্ত্তি

দেখিয়া কিশোরীর ঘুমের ঘোর ছুটিয়া পলাইল, সে স্তম্ভিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—"ছোটবাবু বিজয়া কোথায় ?" কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল,—"বিজয়া ! বিজয়া কোথায় !" বৃদ্ধ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"বিজয়া কোথায় তা তুমিই জান, ছোটবাবু,—বিজয়া কোথায় ?" কিশোরী বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল,—"তা আমি কি জানি !" জয়চাঁদ বলিল—"জান না ?" কিশোরী উত্তর করিল "না।" তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার উপরে পড়িল, সুদীর্ঘ ছুরিকা তাহার দেহ ভেদ করিয়া পিঠের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। কিশোরীর দেহ শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। জয়চাঁদ ছোরাখানা বাহির করিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে আসিল।

বৃদ্ধ বদনচৌধুরী অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন। দশমীর দিনে ঝড়জলে লোকজন উঠিবে না, ভাবিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে জাগাইতে আসিতেছিলেন। জয়চাঁদ যখন কিশোরীকে হত্যা করিয়া গৃহের বাহিরে আসিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তিনি উঠানে পা দিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া জয়চাঁদ দূর হইতে বলিল,—"বাবু, দাঁড়ান।" তাহার বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার রক্তাক্ত দেহ ও হাতের ছোরা দেখিয়া বৃদ্ধের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। জয়চাঁদ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"তোমার কোন ভয় নাই, বাবু। অনেক দিন তোমার রাজ্যে নির্ভয়ে বাস করেছি, কিন্তু তোমার ছেলে হ'তে জয়চাঁদের জাত গেল। তাই তোমায় নির্ব্বংশ করে আসৃছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ছোরা নিজের বুকে বসাইয়া দিল, তাহার দেহ চৌধুরী মহাশয়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

বিজয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল সে "বাঁওড়ের" ধারে পড়িয়া আছে, তখন পূর্ব্বদিকে উষার আলোক দেখা দিয়াছে মাত্র। সে গৃহে ফিরিল, দেখিল পিতার পরিত্যক্ত বস্ত্র পড়িয়া আছে, আর পুরাতন ছোরাখানির খাপখানি পড়িয়া আছে। বিজয়া সেই অবস্থাতেই বাহির হইল, তখন পথে দুই একজন লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন লোক তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিল, সে তাহা শুনিতে পাইল না। গ্রামে প্রবেশ করিয়া শুনিল, চৌধুরী বাড়ীর দিকে গোলমাল হইতেছে। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিল, দেখিল—উঠানে তাহার পিতার দেহ পড়িয়া আছে। অনেক লোক দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহা দেখিতে পাইল না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "বাবা গো! আমি জাত খোয়াইনি।" এই বলিয়া বিজয়া পিতার মৃত দেহের উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, আর উঠিল না। সুদীর্ঘ ছুরিকা জয়চাঁদের দেহ ভেদ করিয়াও প্রায় অর্দ্ধ হস্ত বাহির হইয়া ছিল, পতন মাত্র তাহা অনাথার হৃদ্‌পিণ্ড বিদ্ধ করিল।

দশমীর প্রভাতে সানাই বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গাহিতে আরম্ভ করিল—

গমন সময়ে উমা, আয় মা একবার কোলে করি।
আবার কবে দেখা হবে কি জানি বাঁচি কি মরি।

পথ-হারা।

নদীর জল কমিয়া আসিয়াছে, জল সরিয়া গিয়া কাদা বাহির হইয়াছে, এই সময়ে পল্লীগ্রামে নদীতে স্নান করিবার বড়ই অসুবিধা। শুধু স্নান করিবার কেন, সকল বিষয়েরই অসুবিধা। হেমন্তের শেষে শীতের প্রারম্ভে বর্ষার জল বদ্ধ হইয়া নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করিতে থাকে। রোগক্লিষ্ট কৃষক শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পক্ক ধান্যের দিকে চাহিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া, আশায় দিনযাপন করে। যাহারা নদীতীরে বাস করে, তাহাদিগের এ সময়ে জলের বড়ই কষ্ট। নদীতে জল থাকিলে তাহা আনা কষ্টসাধ্য। নদীতীর তরল কর্দ্দমে পরিণত হয়, সেইজন্য গ্রামের লোকে বাঁধা ঘাট না থাকিলে কাদার উপরে কাঠ ফেলিয়া বা ইঁট ফেলিয়া পথ করিয়া দেয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি কিশোরী অতি সন্তর্পণে জলে নামিতেছিল। ভাগীরথীর তীরে একটি পুরাতন বাঁধা ঘাট, যে কালে ভাগীরথীর রূপ-যৌবনগর্ব্ব ছিল ঘাটটিও সেই কালের। কালের প্রভাবে জীর্ণা শীর্ণা নদী ঘাট হইতে সরিয়া গিয়াছে, ঘাটের নিম্নের সোপানগুলি মৃত্তিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল বর্ষার সময়ে ঘাটে জল আসিয়া থাকে। কিশোরী সোপান কয়টি অতিক্রম করিয়া কর্দ্দমের উপর দিয়া চলিয়াছে। চারি পাঁচখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া পথ বাঁধিয়া দিয়াছে, বড় বড় তাল গাছের উপরে কাঠ বাঁধিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু লোকের

পায়ে পায়ে কাদা উঠিয়া পথ এত পিচ্ছিল হইয়াছে, যে কিশোরী সে পথে চলিতে ভরসা করিতেছে না। সে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া কাদার উপর দিয়া চলিতেছিল, তাহার হাতে একখানি পিতলের রেকাবি, তাহাতে কাঁচা মাটীর কয়েকটী প্রদীপ, তুলার সলিতা ও ঘৃত দিয়া সাজান। সেইগুলি পড়িয়া যাইবার ভয়ে কিশোরী অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল, পা পিছলাইয়া যাইবার ভয়ে সে একবার পথের কাঠগুলি চাপিয়া ধরিতেছিল।

ঘাটের রাণার উপরে বসিয়া একটি কর্দ্দমলিপ্ত বালক আমসত্ব ভক্ষণ করিতে করিতে বালিকার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল, বালিকা একবার পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, বালক তাহা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বালিকা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল; তখন বালকটি বলিয়া উঠিল "সুরি, থালাখানা আমাকে দে, আমি পৌঁছে দিই?" বালিকা উত্তর করিল "তোর যে এঁটো হাত!"

বালক। তা হোক্‌গে—কেউ তো আর দেখতে আসছে না।

বালিকা। দূর পাগল, তাই কি হয়, এ যে ঠাকুরদের জিনিষ।

বালক। ঠাকুররা তো আর দেখতে আস্‌ছে না।

বালিকা। মা বলেন, ঠাকুররা সব দিকে সব সময় দেখতে পান।

বালক। বাবা, তুই যেন ভাই পুরুত মশাই! তোর সঙ্গে কথা কইবার যো নাই।

বালিকা কথা কহিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল আবার চলিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার পা পিছলাইয়া গেল, সে পথের কাঠ ধরিয়া সামলাইল বটে, কিন্তু রেকাবী হইতে দুইটী

প্রদীপ পড়িয়া গেল। বালক হাসিতে হাসিতে কাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিল, বলিল "দেখ্‌লি সুরি, আমি তখনই তোকে বলেছিলুম, থালাখানা আমায় দে, আমি পৌঁছে দিই, তা আমার কথা শুনলি নি, এখন কি করবি কর"। বালিকা হাসিয়া বলিল "কি আর করব বাড়ী ফিরে যাই, আবার গিয়ে নিয়ে আসি, মা অনেক প্রদীপ গড়িয়ে রেখেছেন"। বালিকা ধীরে ধীরে ধীরে ঘাটের উপর উঠিল, বালকও ফিরিল। বালিকা গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া বালক বলিল "সুরি, তুই তবে বাড়ী চল্লি? আমি এই খানে বসে থাকি। তোর সঙ্গে এক সঙ্গে বাড়ী যাব।"

বালিকা ঘাটের উপরে উঠিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার সম্মুখ দিয়া একটি শৃগাল দৌড়িয়া চলিয়া গেল, বালিকা সভয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিল "মণি, ও মণি, শিগ্‌গির আয়না ভাই!" বালক তখন ঘাটের রাণার উপর বসিয়া এক মনে আমসত্ব ভক্ষণ করিতেছিল, সে অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দিল "কেন"? বালিকা তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আরও চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মণি, শিগ্‌গির আয়।" বালক আমসত্ব ফেলিয়া এক লম্ফে বালিকার নিকট উপস্থিত হইল এবং ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি? কি হয়েছে?" বালিকা তখনও ভয়ে কাঁপিতেছিল, সে ধীরে ধীরে বলিল "ভাই, একটা শিয়াল, তুই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়"। বালক খুব একচোট হাসিয়া লইল, তাহার পর বলিল "চল্ যাচ্ছি।"

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, গঙ্গাবক্ষ হইতে বাষ্পপুঞ্জ উত্থিত হইয়া তীরে কুয়াসার সহিত মিশিতে লাগিল,

পথ-হারা।

অস্তাচলগামী মরীচিমালীর রশ্মিতে পশ্চিম গগন সিন্দূররঞ্জিত হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সোনার থালাখানি অদৃশ্য হইল। গঙ্গাতীরের অদূরে বৃক্ষরাজীর মধ্যে গ্রামখানি অবস্থিত, ধান্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া উভয়ে সেই দিকে চলিতেছিল। পবন হিল্লোলে সুপক্ক ধান্যশীর্ষগুলি আন্দোলিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল গঙ্গাতীরে হরিদ্বর্ণ সরোবরের বিশাল বক্ষে তরঙ্গরাশি নৃত্য করিতেছে। ধান্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

গ্রামখানির নাম দৌলতপুর, ইহার অধিকাংশ অধিবাসীই ভদ্রলোক। গ্রামের জমিদার গ্রামেই বাস করেন। পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না, বহু কষ্টে লেখা-পড়া শিখিয়া উকিল হইয়াছিলেন, তাহার পর তাঁর ভাগ্য ফিরিল, চঞ্চলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী গ্রামের বুনিয়াদী জমিদার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সদাশিব মিত্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেনার দায়ে যখন জমিদার প্রবোধচন্দ্র ঘোষের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল, তখন সদাশিব মিত্র বাস-গ্রামখানি কিনিয়া লইলেন; এখন তিনিই গ্রামের জমিদার। সদাশিব পূর্ব্বে বড় গ্রামে আসিতেন না; কিন্তু জমিদারী খরিদ করিবার পর হইতে ছুটির সময় গ্রামে আসিয়া থাকেন, দুই একটি করিয়া পূজা-পার্ব্বণও আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রামের কেহ কেহ পূর্ব্ব-অভ্যাস মত প্রবোধ বাবুকে জমিদার বলিয়া ফেলিলে, মিত্র মহাশয় বড়ই অসন্তুষ্ট হন।

পুরাতন জমিদার-বংশ লোপ হইতে চলিয়াছে। প্রবোধ বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি, সুরমা তাহার এক মাত্র কন্যা, আর সন্তান হইবার কোন আশাও নাই। প্রবোধ বাবু সময় সময় দুঃখ করিয়া

বলিতেন ঠিক সময়ে মালক্ষ্মী ঘোষবংশের বাস্তুভিটা ছাড়িয়াছেন। মেয়েটার বিবাহ দিয়া স্ত্রী-পুরুষে কাশী চলিয়া যাইব, বাড়ীঘর পড়িয়া যাইবে, তাহা আর আমাকে চোখে দেখিতে হইবে না। মিত্র গোষ্ঠীর সহিত ঘোষ বংশের প্রকাশ্য বিবাদ না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। এক-পুরুষের জমিদার বলিয়া অনেকেই সদাশিব মিত্রকে উপহাস করিতেন, মিত্র মহাশয়ও অন্নহীনের বুনিয়াদী চাল সম্বন্ধে নানান কথা বলিতেন।

মণিলাল, সদাশিব মিত্রের একমাত্র পুত্র, মিত্র মহাশয়ের আরও অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই বাঁচিয়া নাই। হারা-মরা বলিয়া মণিলাল বড়ই আদরের। মণিলাল বড়ই দুষ্ট, গ্রামের কোন ছেলের সহিত তাহার বনে না। তাহার গুণের মধ্যে একটি, সে পড়া-শুনায় বড়ই মনোযোগী। এই জন্যই তাহার পিতা দুষ্টামির জন্য তাহাকে কিছু বলেন না। মণিলাল যতদিন সহরে ছিল, ততদিন কাহারও সহিত মিশিত না, কিন্তু দৌলতপুরে আসিয়া তাহার এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। সুরমার সহিত কোথায় তাহার পরিচয় হইয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে ক্রমশঃ সুরমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কথার বাধ্য হইয়া সুরমাকে সময়ে সময়ে মিত্র বাড়ী যাইতে হইত, আর সেতো সমস্ত দিনই সুরমাদের বাড়ী কাটাইয়া দিত। সদাশিব মিত্র নিষেধ করিয়াও মণিলালের সুরমাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। প্রবোধ বাবুও প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে চটিতেন। কিন্তু উভয় গোষ্ঠিতেই ইহাদের যাতায়াত সহিয়া গিয়াছিল।

সুরমার মাতা তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতেছিলেন, দূরে হইতে সুরমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সুরি, তুই যে বড় ফিরে এলি ?"

সুরমা। কাদায় পড়ে গিয়েছিলুম মা, তাই আবার প্রদীপ নিতে এসেছি।

মাতা ঠাকুর ঘর হইতে প্রদীপ বাহির করিয়া দিলেন, কন্যা তাহা রেকাবীতে তুলিয়া লইল, মাতা তখন আবার বলিলেন "তুই অন্ধকারে একা যেতে পারবি ত ?"

সুরমা। একা কেন, আমার সঙ্গে যে মণিলাল এসেছে ?

মাতা। কই ?

সুরমা। ওই যে কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

মাতা। আমিত তাকে দেখতে পাইনি।

বাস্তবিক মণিলাল নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল। সুরমা আঙ্গিনা ছাড়াইয়া বাহির হইল, মণিলাল কিছু না বলিয়া পিছু পিছু চলিল।

সুরমার মাতা তুলসীতলায় প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে ঠাকুর ! আমার সুরির যেন মণিলালের সঙ্গে বিবাহ হয়।

২

দীর্ঘ বৎসর গুলা যেন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়, কালের গতি অবিরাম, কিন্তু নীরব। দেখতে দেখতে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। দৌলতপুর গ্রামে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সুরমা আর কিশোরী নাই, মণিলালও কাদা মাখিয়া গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমসত্ব খায় না। সুরমা এখন পূর্ণ যুবতী, কিন্তু এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই।

মণিলাল বড় হইয়া উঠিয়াছে, সে এখন কলিকাতায় কলেজে পড়ে। আধুনিক যুবা-জনোচিত সভ্যতার আদব কায়দাগুলি মণিলালের বেশ অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার পাড়াগেঁয়ে ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে। পুত্র সৌখীন হইয়াছে দেখিয়া মণিলালের মাতা বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু মণিলাল বিবাহ করিতে চায় না। সে কলিকাতা হইতে দৌলতপুরে বড় একটা আসিতে চায় না, কলেজে ছুটী হইলে হয় অন্য স্থানে বেড়াইতে যায়, না হয় কলিকাতাতেই থাকে। বৎসরের মধ্যে দুই একবার যখন বাড়ী আসে, তখন মণিলাল সর্ব্বাগ্রে সুরমাদের বাড়ী ছুটিয়া যায়।

মণিলাল বিবাহ করিতে চায় না, কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হইতে বাকি রহিল না। কুৎসা যাঁহাদিগের উপজীবিকা তাঁহাদিগের একটা নূতন খোরাক জুটিল, কেহ বলিলেন সুরমা স্বয়ম্বরা হইয়াছে, কেহ বলিল মণিলাল গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়াছে, কোন কোন দূরদর্শী রাজনৈতিক ইহাতে রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনীর পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইলেন। যাহাদিগকে লইয়া এত কথা চলিতেছে ক্রমশঃ একথা তাহাদিগের কর্ণেও পৌঁছিল, সুরমা লজ্জায় মরিয়া গেল, মণিলাল দৌলতপুরে আসা পরিত্যাগ করিল।

মণিলালের মাতা ভাবিলেন, যে ছেলে হয়ত সুরমার জন্যই বিবাহ করিতে চায় না, এবং স্থির করিলেন যে সুরমার সহিত সম্বন্ধ হইলেই মণিলালের বিবাহে আপত্তি থাকবে না। স্বামীকে রাজি করিতে তাঁহার বড় বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ মণিলালের জন্য সদাশিবও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথাসময়ে সদাশিব মিত্রের প্রস্তাব প্রবোধ

বাবুর নিকট উপস্থিত করা হইল, মিত্র মহাশয় ভাবিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হইবে, সেইজন্য তিনি বিবাহ সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ঘটক যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, প্রবোধ ঘোষ মিত্র-বংশে কন্যাদান করিবে না, তখন বিস্ময়ে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। সুরমার মাতা কিছুতেই স্বামীর মত করাইতে পারিলেন না, প্রবোধ ঘোষ অপমান ভুলিতে পারে নাই, প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল যে সদাশিব মিত্রের পুত্রকে কন্যা-দান করিবে না। কলিকাতায় মণিলাল সব কথা শুনিয়াছিল। সে স্থির করিল যে দৌলতপুর গ্রামে আর যাইবে না।

অনেক অনুসন্ধানের পরে সুরমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল, দূর দেশের একজন ধনবান জমিদার যৌবনের শেষে পত্নীহারা হইয়া একটি বয়স্থা সুন্দরী পাত্রীর অনুসন্ধান করিতেছেন, সুরমাকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইল। শুভদিন দেখিয়া সুরমার বিবাহ হইয়া গেল, লজ্জায়, ঘৃণায়, অভিমানে মিত্রজা মরমে মরিয়া গেলেন। যথাসময়ে মণিলাল সুরমার বিবাহের কথা শুনিল, শুনিয়া পাঠে দ্বিগুণ মনঃসংযোগ করিল, সদাশিব মিত্র ভাবিলেন পুত্রের জীবনের ছায়া কাটিয়া গেল।

সুরমা এখন ধনীর গৃহিণী, পিত্রালয়ে আসিবার অবসর পায় না, আসিলেও দু-একদিন থাকিয়া চলিয়া যায়। প্রবোধ ঘোষ ভদ্রাসনখানি এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া কাশীবাসের চেষ্টায় আছেন। তিনি বলিয়া থাকেন যে সুরমাকে এমন ঘরে দিয়াছেন যে তাহার পক্ষে পিতৃগৃহে আসা অসম্ভব, সুতরাং তিনি কাশীবাস করিলেও সে কখনও তাঁহার অভাব অনুভব করিবে না।

বহুকাল পরে সুরমা দৌলতপুরে আসিয়াছে, তাহার পিতা মাতা কাশীযাত্রা করিবেন, সেই জন্য একবার দেখা দিতে আসিয়াছে। সুরমা আসিয়া শুনিয়াছে যে সদাশিব মিত্র ও তাঁহার পত্নী গঙ্গালাভ করিয়াছে, মণিলালদের বাড়ীতে আর কেহই নাই, সে নিজে কলিকাতায় থাকে, ভুলিয়াও দেশে আসে না। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়া সুরমা মণিলালদের বাড়ীখানি দেখিয়া আসিয়াছে, দেখিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আসিয়াছে। এই সেদিন সে সদাশিব মিত্রের কোলাহলপূর্ণ অট্টালিকায় সুখের সংসার দেখিয়া গিয়াছে, আর আজি দুইদিন পরে সেখানে মহাশ্মশান।

প্রবোধ বাবু যেদিন কাশীযাত্রা করিবেন, সেই দিন প্রভাতে সুরমা একটি দাসী সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়াছে। তাহার শ্বশুরালয় হইতে গঙ্গা বহুদূর, সেই জন্যও বটে, আর জন্মের মত শৈশবের লীলা-ক্ষেত্র, বাল্যের কৈশোরের সুমধুর স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি দেখিবার জন্যও বটে, সুরমা পুরাতন বাঁধা ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। ঘাটের অবস্থা ক্রমশঃ অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, চাতাল ও রাণাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কেহই সংস্কার করিয়া দেয় না। ঘাটের ধাপগুলি কাদায় ভরিয়া গিয়াছে, গঙ্গার জলও অনেকদূর সরিয়া গিয়াছে, এখন বর্ষার সময়েও ঘাটে জল আসে না, ঘাটের অবস্থা দেখিয়া সুরমার চোখে জল আসিল। গ্রামের লোক এখন আর ঘাট ব্যবহার করে না; স্নান করিতে আসিয়া ঘাটের পাশ দিয়া চলিয়া যায়, সুরমা গ্রামের পথ ছাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঘাটের উপর উঠিল। সে দেখিল যে সকলের নীচের ধাপে একজন সুসজ্জিত পুরুষ বসিয়া আছে।

সুরমা দাঁড়াইল, তাহার দাসী তখনও পশ্চাতে পড়িয়াছিল, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই পুরুষটি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরমা ঘোমটা টানিয়া ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া একপাশে দাঁড়াইল, যুবক তাহা দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া ডাকিল "সুরমা!" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সে মণিলাল। মণিলাল তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল "সুরমা আমায় চিনিতে পারিলে না?" সুরমা তখন একটা প্রণাম করিয়া বলিল "হ্যাঁ পেরেছি, আপনি মণিদা!" উত্তর শুনিয়া যুবকের মুখ লাল হইয়া উঠিল। উভয়ে অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মণিলাল কহিল "সুরমা, তুমি দৌলতপুর ছেড়ে যাবে শুনে একবার দেখিতে এলাম।" সুরমা কোন উত্তর দিল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মণিলাল আবার বলিল "সুরমা তবে এখন আসি।" সুরমা কি বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না, মণিলাল ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৩

কলিকাতায় জগন্নাথ ঘাটে আজ লোকের বড় ভিড়, কারণ আজ বারুণী। পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছে, গঙ্গার ধারের পথে লোক আর ধরিতেছে না, তাহার ভিতরে সারি সারি গাড়ী আসিতেছে। একখানি বড় ল্যাণ্ডো গাড়ী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা হইতে তিনটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোক নামিল, একজন চাকর তাহাদিগের কাপড় গামছা ইত্যাদি নামাইয়া লইল। স্ত্রীলোক দুইটি অবগুণ্ঠনহীনা, দেখিলে ভদ্রঘরের স্ত্রী বলিয়া বোধ হয় না, তাহারা ঘাটের

সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। ল্যাণ্ডোর পিছনে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়াছিল, তাহা হইতে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ও দুইজন দাসী নামিয়া দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। পুরুষ তিনজনের মধ্যে দুইজন অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য ঘাটের সম্মুখে লোক জমিয়া গিয়াছিল, স্ত্রীলোক তিনটি পথ না পাইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে একজন দরওয়ান আসিয়াছিল, সে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতায় ভিড়ের সময়ে পথে গাড়ী দাঁড়াইতে দেয় না, সেইজন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া গাড়ী হইতে নামিতে হইয়াছিল, এবং মাতালের দল সম্মুখে পড়ায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপেক্ষা করিতে হইতেছিল।

সুখের বিষয় কলিকাতায় অধিকক্ষণ ভিড় থাকিতে পায় না, একজন কনষ্টেবল আসিয়া ভিড় সরাইয়া দিল। ঘাটের লোকে স্ত্রীলোক দুইটিকে পুরুষদের ঘাটে নামিতে দিল না, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়া স্ত্রীলোক-দিগের স্নানের ঘাটে যাইতে বলিল। ভাড়াটিয়া গাড়ীতে যে বিধবা রমণী দুইটি দাসী লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছিলেন, বেশ্যা দুইটিও, তাঁহারা যেখানে স্নান করিতেছিলেন সেই স্থানে গিয়া জলে নামিল। তাহারা নানা ছলে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিধবা রমণীটি তখন স্নান করিয়া পূজা করিতেছিলেন, দাসীদ্বয় তাহা-দিগের সহিত কথা কহিতে লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে দাসীদ্বয় দৌলতপুর হইতে আসিতেছে তখন তাহারা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল যে তাহাদিগের 'বাবু' দৌলতপুরের জমিদার। দাসীরা নাম জিজ্ঞাসা

করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিল "বাবুর নাম মণিলাল মিত্র।" নাম শুনিয়া রমণীর পূজায় বাধা পড়িল, তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে বাছা, কি নাম বলিলে?"

"বাবুর নাম মণিলাল মিত্র।"

"তাহার বাড়ী কি দৌলতপুরে?"

"তিনি দৌলতপুরের জমিদার।"

রমণীদ্বয় 'বাবুর' ঐশ্বর্য্য-গৌরবের পরিচয় দিতে লাগিল। " 'বাবু' তাহাকে কলিকাতায় বাড়ী কিনিয়া দিয়াছেন, বহুমূল্য আসবাবে তাহা সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, হীরা-মুক্তার অলঙ্কারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সাজাইয়া দিয়াছেন, দাস, দাসী, গাড়ী, ঘোড়া, সমস্তই তাঁহার, এমন কি তাহার জন্য 'বাবু' বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই। দাসীদ্বয় অবাক হইয়া তাহাদিগের কথা শুনিতেছিল, কিন্তু বিধবা মহিলাটী বোধ হয় তাহার অধিকাংশই শুনিতে পান নাই, কারণ তিনি তখন অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া পুনরায় পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূজা শেষ করিয়া বিধবা মহিলা জল হইতে উঠিলেন, দাসীদ্বয়ও উঠিল, বেশ্যা দুইটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। ঘাটের উপরে সঙ্গীত্রয় বেশ্যাদ্বয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার পর দরওয়ানকে ডাকিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজনকে তাহার নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

দরওয়ান পুরুষটিকে ডাকিবামাত্র সে ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল ও সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বিধবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রমণী হঠাৎ অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মণিদাদা, আপনি আমাকে চিনিতে পারেন?" এই বলিয়া গলায় কাপড় দিয়া তাহাকে

প্রণাম করিল। পুরুষটী আশ্চর্য্য হইয়া দুইহাত সরিয়া গেলেন, তাহার পর বলিলেন "কে আপনি আমিত চিনিতে পারিতেছি না।"

রমণী। "একেবারেই চিনিতে পারিতেছেন না?"

পুরুষ। কই—না?

রমণী। আমি সুরমা।

পুরুষটী দুই হাত পিছু হটিয়া গেল,—বলিল "তুমি—সুরমা?"

রমণী। হাঁ আমি সুরমা! মণিদাদা আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কাজ আছে।

আমি আজ দু বছর বিধবা হয়েছি, বড়ই বিপদে পড়েছি। আপনি আমায় সঙ্গে করে আপনার বাসায় নিয়ে চলুন। আমার সঙ্গে লোক আছে, তাতে আপনার কোনও লজ্জা নাই।

মণিলাল বিষম বিপদে পড়িল। কলিকাতায় তাহার বাসা নাই, সে যেখানে থাকে, সেখানে ভদ্র গৃহস্থের স্ত্রীলোক লইয়া যাওয়া যায় না। যাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেই বা ফেলিয়া যায় কোথা? বহুকাল পরে সুরমার দেখা পাইয়াছে, তাহার একটা অনুরোধ, বিশেষ সে যখন বিপদে পড়িয়াছে, এড়াইতেও তাহার মন সরিতেছে না। সুরমা তখন বলিল "আমায় আজ নিয়ে যেতেই হবে, আমি বড় বিপদে পড়েছি, মণিদাদা! আমার দেওরের সঙ্গে বিষয় নিয়ে মকদ্দমা চলছে, আমার পক্ষে কেউ নাই।"

মণিলাল অনেকক্ষণ গুম হইয়া থাকিল, অনেকক্ষণ পরে আমতা আমতা করিয়া বলিল "আমার ত এখানে বাসা নাই সুরমা, আমি পরের বাড়ী থাকি, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব কি করে?"

সুরমা। তবে আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পরিয়া মণিলাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরমা তাহার দরওয়ানকে গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিল, গাড়ী আসিল। সুরমা মণিলালকে তাহাতে উঠিতে বলিল। কলের পুতুলটির মত মণিলাল গাড়ীতে গিয়া উঠিল, তাহার পুরুষ সঙ্গী দুইজন দৌড়িয়া আসিল, মণিলাল তাহাদিগকে বলিল "তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি পরে যাইব।" দাসীদিগকে লইয়া সুরমা গাড়ীতে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল, মণিলালের সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

৪

গাড়ীখানি একটি প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। মণিলাল আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ফটক পার হইয়া একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে গাড়ীখানি দাঁড়াইল। মণিলাল নামিয়া আসিলে একজন আমলা তাহাকে লইয়া গিয়া বৈটকখানায় বসাইল। সুরমার বাড়ীর সাজসজ্জা দেখিয়া মণিলাল অবাক হইয়া গেল। চারিদিকে বহুমূল্য আসবাব, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর দাসদাসীতে পরিপূর্ণ, অবিলম্বে তাহার ডাক পড়িল, মণিলাল অন্দরে গিয়া আহার করিতে বসিল। সুরমা তাহাকে বসিয়া খাওয়াইল! অপরাহ্নে মণিলাল চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল, সুরমাকে খবর দিয়া পাঠাইল, এবং সুরমা আসিলে বলিল "কই, কি মকদ্দমার কথা বলিবে বলিয়াছিলে?" সুরমা বলিল "কাল সকালে আমার দেওয়ান আসিবে, তখন সমস্ত কথা হইবে।" সন্ধ্যার সময়ে অভ্যাসের দোষে মণিলাল চলিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট করিতে লাগিল, কিন্তু লজ্জায় কোন

কথা বলিতে পারিল না। সুরমার বাড়ীতে আসিয়া মণিলাল যেমন আরাম পাইয়াছিল, এমন আরাম সে বহুদিন পায় নাই। বাড়ীর লোকে যেন তাহার জন্য কাপড় জুতা জামা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কোন অভাব বুঝিতে দিতেছে না।

প্রভাতে উঠিয়া মণিলাল সুরমার নিকট খবর পাঠাইল, শুনিল সে পূজায় বসিয়াছে। বেলা নয়টার সময় দেওয়ান আসিলে, সুরমা মণিলালকে ডাকিয়া পাঠাইল, মণিলাল অন্দরে গিয়া মকদ্দমার কথা সমস্ত শুনিল। দ্বিপ্রহরে আহারের সময় মণিলাল সুরমাকে বাসায় ফিরিবার কথা বলিল, তাহার উত্তরে সুরমা বলিল "মণিদাদা তুমি যেখানে আছ, সেখানে তোমার আর যাওয়া হবে না।" মণিলাল মুখ হেট করিয়া রহিল, লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিল না।

এইরূপে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, মণিলালের ফিরিয়া আসা হইল না, তাহার সঙ্গীর দল তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া গেল, সুরমার আদেশে তাহারা বাড়ী ঢুকিতে পাইল না। একদিন রাত্রিতে আহারের সময় সুরমা বলিল, "মণিদা, তুমি এবার বিয়ে করে সংসারী হও?" মণিলাল মুখ গুঁজিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। তাহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই সুরমা বিবাহের কথা পাড়িত, কিন্তু মণিলাল উত্তর দিত না। একদিন সে বলিল, "আমি বিবাহ করিব কিন্তু তুমি দিতে পারবে কি?"

সুরমা। পারব;—তুমি যেমন কনেটি চাও আমি তেমনিটি খুঁজে বার করবো।

মণিলাল। আমি এতদিন কেন বিয়ে করিনি, তা তুমি জান সুরমা?

সুরমা। গ্রহের দোষে।

মণিলাল। গ্রহের দোষই বল, আর বরাতের দোষই বল, একজনের দোষ বটে।

তাহার পর মণিলালের মুখ খুলিয়া গেল। সে বলিল, "সুরমা, তোমাকে পাইনি বলে এতদিন বিয়ে করিনি, তোমাকে যদি কখনও পাই তবে বিয়ে করবো, তা নইলে এজন্মে আর নয়।" সুরমা ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া পলাইল; আর দুই তিন দিন মণিলালের সম্মুখে বাহির হইল না। বিরক্ত হইয়া মণিলাল চলিয়া যাইতে চাহিলে সুরমা তাহার সহিত দেখা করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল, সুরমা আর বিবাহের কথা পাড়িত না।

দিন দিন উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল, মণিলাল অধিক সময়ই অন্দরে কাটাইত। সুরমার পূজার সময় তাহার নিকটে নীরবে বসিয়া থাকিত, রাত্রিতে তাহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইত, দিনের বেলায় দেওয়ানজীর সহিত একত্র বসিয়া কাজ করিত। মণিলালের দিন বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। তাহাদিগের ভাবে কোন দোষ না পাইলেও লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল, মণিলাল তাহা শুনিয়াও গ্রাহ্য করিল না। সুরমা তাহা পারিল না,—মরিল।

একদিন রাত্রিশেষে মণিলাল দেখিল বৃদ্ধ দেওয়ান তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, দেওয়ান বলিলেন, "আপনি শীঘ্র আসুন, কর্ত্রীর মৃত্যুকাল উপস্থিত?" এক লম্ফে মণিলাল অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিল নারায়ণের ঘরের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া সুরমা ছটফট করিতেছে। মণিলাল আসিতেই তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "মণিদাদা আমি চলিলাম, আমার একটি কথা রাখিও,

—বল রাখিবে ?" মণিলাল তাহাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করিল, তখন সুরমা ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মরিলে বিবাহ করিয়া সংসারী হইও।" মণিলাল কথা কহিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। মৃত্যুর গাঢ় নীলিমায় তখন সুরমারসুবর্ণ গৌরকান্তি ঢাকিয়া যাইতেছিল, মরণ-কাতরকণ্ঠে সুরমা বলিয়া উঠিল, "সে যে তাঁহার জন্যই মরিতেছে; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যখন অপরের হস্তে পড়িয়াছিল, তখন বহু চেষ্টা করিয়া কৈশোরের আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়াছিল। তাহাকে সুপথে আনিয়া সংসারী করাইবার জন্যই সে তাহাকে গঙ্গাতীর হইতে আনিয়াছিল, পথ দেখাইতে গিয়া সে নিজে পথ হারাইয়াছিল। পথভ্রান্ত পুরুষের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু কুলনারীর নাই, তাই সে মরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিল।

ভবিতব্য

অনেকদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি, দেশে এখন সবই যেন নূতন মনে হইতেছে, সবই বড় মধুর লাগিতেছে। অনেকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রাণের আনন্দে খুব ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। থিয়েটার, সার্কাস, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ইডেন গার্ডেন্, গড়েরমাঠ দেখিয়া যেন আর আশা মিটিতেছে না। ইডেন গার্ডেনের সম্মুখেই জাহাজ লাগিবার জন্য মস্ত একটা নূতন ঘাট তৈয়ারী হইয়াছে। বিদেশ যাইবার পূর্ব্বে সেটা দেখিয়া যাই নাই, তাই প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া সেখানে যাইতাম। প্রতিদিন কত লোক আসিত, কত লোক জাহাজে চড়িয়া চলিয়া যাইত, তাই দেখিতাম।

জেটির উপরে ষ্টীমার ষ্টেসন, সেখানে অনেকগুলি লোক-লস্কর থাকে, তাহারা সকলেই প্রায় চট্টগ্রামনিবাসী, ক্রমে তাহাদিগের সহিত আলাপ হইয়া গেল। যে তাহাদিগের সারেঙ, সে কাজ না থাকিলে জেটির ডেকে বসিয়া জাল বুনিত ও আমার সহিত গল্প করিত। তাহার নাম আবদুল, বিশাল কর্ণফুলি নদীর তীরে তাহার বাস, পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যাহা সে দেখে নাই। আজীবন বড় বড় জাহাজে খালাসী ও লস্করের কাজ করিয়া বুড়া বয়সে সে এই জেটীর সারেঙের পদ পাইয়াছে। আবদুল ডেকে বসিয়া ক্ষিপ্রহস্তে জাল বুনিয়া যাইত,

আর আমাকে নানান দেশের গল্প শুনাইত। বিদেশ হইতে আসিয়া আমি এখনও বাড়ী যাই নাই শুনিয়া বৃদ্ধ বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, আমাকে বলিল "বাবু আমি ভাবিয়াছিলাম কলিকাতাতেই আপনার বাড়ী।" দেশে আমার কেহ নাই; যাঁহারা আমার ছিল, তাঁহাদের হারাইয়া উদাস প্রাণে সপ্তদশ বর্ষ বয়সে মহাসমুদ্রের পারে গিয়াছিলাম। শুনিয়া বৃদ্ধ দুঃখিত হইল। জ্ঞাতি যাঁহারা আছেন তাঁহারা যে আমাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহা বলিবামাত্র বৃদ্ধ বুঝিতে পারিল। তাহার দেশেও তাহার জ্ঞাতিবর্গ আছে। সে যখন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সানন্দে তাহার জমীজমার অংশগুলি ফাঁকী দিয়া লইয়াছিল। তাহার পর বৃদ্ধ যখন শুনিল যে, আমার বয়স ছাব্বিশ বৎসর কিন্তু তখনও বিবাহ করি নাই, তখন সে বড়ই দুঃখিত হইল। বৃদ্ধ বলিল যে, বৃদ্ধা স্ত্রী ও শিশু কন্যা ব্যতীত তাহার জীবনের আর কোন বন্ধন নাই। সে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে কিন্তু তথাপি তাহার স্ত্রী কন্যার নিকট হইতে বহুদূরে আছে। কন্যাটিকে দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে তাহার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। যখন হাতে কাজ না থাকে তখন চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সে একমনে জাল বুনিতে থাকে। ক্রমে জেটির সকল লস্করই আমায় চিনিয়া ফেলিল এবং সারেঙের বন্ধু বলিয়া আমাকে খাতির করিত।

একদিন একখানি জাপানী জাহাজ আসিয়া জেটীতে লাগিতেছিল, আবদুলের সেদিন আর কথা কহিবার অবকাশ ছিলনা। লস্করেরা জাহাজের কাছি বাঁধিতেছিল। সিঁড়ি লাগাইতেছিল, আবদুল ব্যস্ত হইয়া জেটীর চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল! জাহাজখানা তখনও

জেটী হইতে একটু দূরে ছিল, আর আমি একরাশি মোটা কাছির উপরে বসিয়া একদৃষ্টে জাহাজ দেখিতেছিলাম। জাহাজখানি ছোট, তাহার নামটা এখনও মনে আছে, তাহার পশ্চাতে বড় বড় মোটা ইংরাজী অক্ষরে লেখাছিল, "হাকাতা মারু, নাগাসাকি।" জাহাজের উপর সারি সারি জাপানী নাবিক দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলে ইংরাজ বলিয়া ভুল হয়। তাহাদিগের কাপ্তেনও জাপানী। যখন জাহাজখানা জেটী হইতে দশহাত কি পনর হাত তফাৎ আছে, তখন জাহাজের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা হইতে তিনচার বৎসরের একটি শিশু বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বাঙ্গালী বালিকাও কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিল। জাহাজ লাগিবে বলিয়া খালাসীরা রেলিং খুলিয়া লইতেছিল, বালক আসিয়া যেখানে দাঁড়াইল, সেখানকার রেলিং ঢিল-হইয়াছিল, বালক ভর দিবামাত্র রেলিং খুলিয়া জলে পড়িয়া গেল, ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া বালকও গঙ্গার জলে পড়িয়া গেল। বালককে জলে পড়িতে দেখিয়া বালিকা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "মা খোকা ?" তাহার শেষকথাগুলি শোনা গেলনা কারণ সেও সেইসঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বালককে জলে পড়িতে দেখিয়া আমিও তাহার উদ্ধারের জন্য জলে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আমার পূর্ব্বেই বালিকা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আমি জলে পড়িয়াই ডুব দিলাম। আমি ডুবিবার পূর্ব্বে জলে আর একটা গুরুভার দ্রব্যের পতন শব্দ শুনিতে পাইলাম। এক মুহূর্ত্ত পরেই কাহার কাপড় আমার হাতে ঠেকিল, টানিয়া দেখিলাম কাপড় খোলা। গঙ্গার মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াই বালকের দেহ পাইলাম। জলে পড়িয়া বালক তলাইয়া

গিয়াছিল, তাহার পরণের কাপড়খানি তখনও স্রোতের বেগে ভাসিতেছিল। বালকের দেহ লইয়া যখন উপরে উঠিলাম, তখন জাহাজ ও জেটির লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, শুনিতে পাইলাম, সকলে চীৎকার করিয়া জাহাজ থামাইতে বলিল, জেটির উপর হইতে পাঁচ সাতজন লোক আমার হাত হইতে বালকের দেহ তুলিয়া লইল। এমন সময়ে প্রায় বিশহাত দূরে আবদুল ভাসিয়া উঠিল, লোকে তাহাকে দেখিয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু সে হাত নাড়িয়া জানাইল যে সে কিছুই পায় নাই। তাহার পরক্ষণেই আবদুল পুনরায় ডুব দিল, জাহাজ তখন জেটি হইতে পাঁচ হাত দূরে। সকল লোকেই তখন জাহাজ থামাইবার জন্য চীৎকার করিতেছে, জাহাজের কর্ম্মচারীরাও তাঁহাদের ভাষায় কি আদেশ দিতেছিল, তাহা শুনিয়া আমার ভরসা হইল, আমি পুনরায় ডুবিলাম। দুই তিন বার ডুব দিয়া গঙ্গামৃত্তিকা স্পর্শ করিলাম, চতুর্থ বারে বালিকাকে পাইলাম, তখনও তাহার চেতনা ছিল, সে সবলে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। আমি তখন তাহাকে লইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। অল্পদূর উঠিয়াই মাথায় বড় লাগিল, বুঝিলাম জাহাজের বা জেটির তলায় আসিয়াছি, ধীরে ধীরে তলা ধরিয়া উপরে উঠিলাম। তখন আমার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বুঝিলাম জাহাজ থামান হয় নাই। তখন জেটি বা জাহাজের উপরের লোক আমাকে আর দেখিতে পাইতেছে না। বালিকা প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, প্রাণপণ শক্তিতে জেটির পাশে যাইবার চেষ্টা করিলাম। পাঁচ-সাতখানি বড় নৌকার উপরে জেটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, দেখিলাম দুইখানা নৌকার মধ্যে একজন লোক জলে ভাসিতেছে, সে আবদুল।

আমি বালিকাকে তাহার দিকে ঠেলিয়া দিলাম, সে বালিকাকে ধরিল, তাহার পর আর যাইতে পারিলাম না, জাহাজ আসিয়া আমার মাথায় লাগিল, আমার বোধ হইতে লাগিল মাথাটা জাহাজ ও জেটির মধ্যে পিষিয়া গেল, কে যেন চারিদিকে অন্ধকার ঢালিয়াদিল। তাহার পর সব অন্ধকার।

যেদিন আমার সামান্য একটু জ্ঞান হইল, সেদিন মনে হইল, যেন একটা প্রকাণ্ড ঘরের ভিতর কয়খানি খাট রহিয়াছে। তাহার একখানিতে আমি শুইয়া আছি। মাথাটা যেন বড় ভারি, একেবারে তুলিতে পারি না। বিছানা ও বালিসগুলা বড় শক্ত, এক একবার মনে করি কথা বলি, কিন্তু কাহাকে বলিব খুঁজিয়া পাইনা। মাঝে মাঝে একটি বালিকা আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর আবার চলিয়া যায়, একবার মনে হয় তাহাকে ডাকিব, কিন্তু সে আসিলে ডাকিবার কথা মনে থাকে না। মাঝে মাঝে আবার সব অন্ধকার হইয়া যায়।

তাহার পর, কতদিন পর জানিনা একদিন জ্ঞানসঞ্চার হইলে দেখিলাম আমি যেন আর একস্থানে আর একটি ঘরে নীত হইয়াছি। বেশ ছোট ঘরটি, ভিতরটি নীল রঙ্গের কাগজ দিয়া মোড়া, দরজা-জানালা গুলিতে মোটা নীল রঙ্গের পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, মাঝখানে একখানি খাট, তাহাতে নীল রঙ্গের নেটের মশারি। ঘরের ভিতরে দুই একটি ছোট টেবিল ব্যতীত আর কিছুই ছিলনা। খাটে শুইয়া আছি, ভাবিতেছি এখানে কি করিয়া আসিলাম, এ কাহার গৃহ। পূর্ব্বে যেখানে ছিলাম সেখানেই বা আমাকে কে লইয়া গিয়াছিল? ঘরের দরজার পরদা একটু ঈষৎ দুলিয়া উঠিল, সদ্যস্নাতা অবগুণ্ঠনরহিতা অনিন্দ্যসুন্দরী একটি কিশোরী ঘরের

ভিতর প্রবেশ করিল, পা টিপিয়া টিপিয়া আমার খাটের নিকট আসিল, বিশেষ মনোযোগের সহিত আমাকে দেখিল, আমি চাহিয়া আছি দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল, সে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া পলাইয়া গেল। তাহার পরে একজন গৌরবর্ণ প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক গৃহে প্রবেশ করিলেন, অনুমানে বুঝিলাম তিনিই গৃহস্বামী। তিনি আসিয়া আমার খাটের পাশে এক খানা চেয়ার টানিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, তাহারপর জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখন কেমন আছেন ?" আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম যে ভাল আছি। তখন আমাকে অধিক কথা কহিতে নিষেধ করিয়া তিনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, আমি বিছানায় পড়িয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় একজন পরিচিত ব্যক্তি আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল ; সে আবদুল। আবদুলের নিকট সমস্ত সংবাদ পাইলাম। গৃহস্বামীর নাম শ্রীযুক্ত রসময় নন্দী, তিনি বর্ম্মা-প্রবাসী, রেঙ্গুনের রেল-আফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, বহুদিন পরে অবকাশ লইয়া দেশে আসিয়াছেন। জাহাজ হইতে তাঁহারই পুত্রকন্যা জলে পড়িয়া গিয়াছিল। জাহাজে ধাক্কা লাগিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, আবদুল আমাকে গঙ্গাগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। প্রায় একমাস কাল হাঁসপাতালে ছিলাম, তাহারপর রসময় বাবু আমাকে তাঁহার গৃহে আনিয়াছেন, জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিয়া আমার চিকিৎসা করাইয়াছেন, এবং আমার জন্য দেশে না গিয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। আবদুলের কথা শুনিতে শুনিতে আমার চোখে জল আসিল। সেদিন

আবদুল অনেক রাত্রি অবধি বসিয়া আমার সহিত গল্প করিয়া গেল। তাহারপর সে প্রায়ই আসিত, রসময় বাবু স্বয়ং আমার তত্ত্বাবধান করিতেন, কিন্তু সে কিশোরীকে আর দেখিতে পাইতাম না। সপ্তাহ কাল মধ্যে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলাম, গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

আমার নিজের পরিচয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমার নাম শ্রীচন্দ্রশেখর বসু, নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামে। জীবনের প্রথম সপ্তদশ বর্ষ কলিকাতায় কাটাইয়াছি, আমার পিতা আলিপুরে জজ আদালতে ওকালতি করিতেন, কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া অন্ধকার দেখিলাম, আমি আশৈশব মাতৃহীন। কলিকাতায় আসিলাম, তখন যুদ্ধের জন্য আফ্রিকায় সৈন্য যাইতেছিল, এক পিতৃবন্ধুর অনুগ্রহে চাকরি পাইয়া দেশত্যাগ করিয়া ছিলাম, তাহার নয়বৎসর পরে দেশে ফিরিয়াছি। কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র গৃহে আমি এবং আমার বিদেশের সহচর রামদীন বাস করিতাম। আরোগ্য-লাভ করিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম, দেখিলাম দরজায় তালা লাগাইয়া রামদীন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ক্লান্তিবোধ হওয়ায় দরজায় বসিয়া পড়িলাম, মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল। কলিকাতা সহরে কেহ কাহারও খোঁজ খবর লয়না। রাস্তা দিয়া অবিরাম জনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কেহই আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অনেকক্ষণ পরে একটু সুস্থ বোধ করিলাম। পাশে কলেজের ছাত্রদের একটা মেস ছিল, উপরের ঘরে একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম লইয়া কে গাহিতেছিল :—

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই কিছু নাই গো।

ভাবিলাম রসময় বাবুর বাড়ী ফিরিয়া যাই, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া চলিয়াছি, সে রাস্তা ছাড়িয়া বড় রাস্তায় পড়িয়াছি, এমন সময় পিছন হইতে কর্কশস্বরে কে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল, ফিরিয়া দেখি বাল্যবন্ধু সতীশ-চন্দ্র। সে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল এবং গাড়োয়ানকে শ্যামপুকুর যাইতে আদেশ করিল। তাহার পর গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সে আমাকে লইয়া পড়িল। "তুই গিয়াছিলি কোথায়? তোর চাকর ত তোর জন্য কাঁদিয়া আকুল। আজ তিনমাস যে তোর দেখা নেই, তুই গিয়াছিলি কোথায়? রামদীন একমাস তোর প্রত্যাশায় থাকিয়া আর পারিলনা, আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল। আমি তোর বাসা তুলিয়া দিয়া তোর জিনিষ পত্র আমার বাড়ীতে আনিয়া দেশে পত্র লিখিতে ছিলাম আর কি। তোর তিনকুলে কেউ নাই তাত জানি, তবু তোর জিনিষটা পত্রটা তোর জ্ঞাতিরা পাইবে।" সতীশচন্দ্র এক নিশ্বাসে কথা গুলি খুব চেঁচাইয়া বলিয়া হাঁফাইয়া উঠিল। সে চুপ করিলে আমি ধীরে ধীরে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তাহা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সতীশ মানুষটা বড় ভালো, সহজেই রাগিয়া উঠে, কিন্তু তাহার রাগ অধিকক্ষণ থাকেনা। আমার শরীর তখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সতীশ বাড়ী ফিরিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইল, দুই তিন দিনের মধ্যে আমি আর তাহার হাত ছাড়াইতে পারিলাম না।

তিন দিনের দিন সতীশের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। রসময় বাবুর বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দেখি বাড়ী নিস্তব্ধ, যেন লোক জন কেহ নাই। কি জানি কেন মনটা কেমন হইয়াগেল, কম্পিত পদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নিম্নতলে কেহ ছিলনা, দ্বিতলে উঠিয়া দেখি রসময় বাবু ম্লান মুখে বসিয়া আছেন। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি যেন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার বয়স যেন দশ বৎসর বাড়িয়াছে। তিনি আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিলেন, আমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন "বাবা, একবার তুমি মিনুকে বাঁচাইয়াছিলে, আমি কপালের দোষে আবার তাহাকে হারাইতে বসিয়াছি, তুমি তাহাকে বাঁচাও।" আমি অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দান করিয়া মৃণালিনীকে দেখিতে চলিলাম। যে ঘরে আমার চেতনা ফিরিয়াছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেই খাটের উপরে শুষ্ক মৃণালের ন্যায় মৃণালিনী পড়িয়া আছে। তাহার মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া, মাথায় বরফ দিতেছেন, আর অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। মিনু বড়ই ছট ফট করিতে-ছিল। আমি তাহার নিকটে গিয়া বসিলাম। মিনু মাঝে মাঝে অনুচ্চ স্বরে কি বলিতেছিল। আমি তাহার পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। শুনিলাম ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছে যে, তাহার মস্তিষ্কের জ্বর হইয়াছে, জীবনের আশা অতি সামান্য, তবে যদি কোন উপায়ে দুই এক দিন বাঁচাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে রোগিণী রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

আমি আসিবার পর হইতে তাহার অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। এইরূপে দুইদিন কাটিয়া গেল, ডাক্তার আসিয়া যখন বলিয়া গেল আর

বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন রসময় বাবুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে মিনুর শীর্ণ হাতখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন "বাবা, আজ হইতে মিনু তোমার হইল, আর আমাদের নহে।" আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

বলা বাহুল্য মিনু ওরফে মৃণালিনীর সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের বরযাত্রী আবদুল আর রামদীন, আর বরকর্ত্তা স্বয়ং সতীশচন্দ্র। রসময় বাবুর অনুরোধ সত্বেও দেশে কাহাকেও নিমন্ত্রণ করি নাই। মিনুকে লইয়া সতীশের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। ফুলশয্যার সময় আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সতীশচন্দ্র গান ধরিল

কাছে তার যাই যদি, কত যেন পাই নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটেনা।

সতীশের স্ত্রী তখন আমায় ঠাট্টা করিতেছিলেন, তখনি তাঁহাকে ছুটিতে হইল কারণ সতীশের রাসভ-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিল। সেই সময়ে একটা দম্‌কা বাতাসে ঘরের দরজা খুলিয়া গেল। দেখিলাম ছাদে বসিয়া রামদীন গাহিতেছে,

বৈরাগ যোগ করম কঠিন মঁয় না করুরে।

আবদুল তাহার সম্মুখে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছে।

সোণার বালা।

মেয়েটি বড় সুন্দরী। ছোট খাট বেঁটে গড়ন, মাথায় একরাশি কালো কালো কোঁকড়া চুল, চাঁপার কলির মত বর্ণ; তাই মায়ে আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিল নিরুপমা। নিরুপমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন হইতে তাহার মা মেয়ের বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দুর ঘরের, ব্রাহ্মণের ঘরের, বিশেষতঃ গৃহস্থের ঘরের মেয়ে বেশীদিন আইবুড়ো রাখা উচিত নয়, এই ভাবিয়া নিরুপমার মা তাঁহার স্বামীকে বড়ই ব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। নিরুপমার পিতা এক একদিন রাগ করিয়া বলিতেন "হ্যাগা, তোমার হয়েছে কি ? তুমি দেখ্‌ছি মেয়েটাকে বাড়ীথেকে বিদায় কর্‌তে পারলেই বাঁচ।" নিরুর মাতা অপ্রস্তুত হইয়া বলিতেন "আমি কি তাই বলছি ? তবে হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিশেষতঃ আমাদের গরীবের ঘরের, আর কতদিন আইবুড়ো রাখবো। তার উপর তোমার যে গতর, এখন থেকে খুঁজতে আরম্ভ করলে তবে যদি কালে বিয়ে হয়। নিরু আমার শ্বশুরঘরে গেলে আমার দিন যে কি ভাবে কাট্‌বে তা ভগবানই জানেন।" ফলে কোন কাজই হইত না, নিরুর পিতা কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেন। নিরু বাপমার একমাত্র সন্তান, আঁধারঘরের মাণিক, পিতৃগৃহ আলো করিয়াই রহিল। নিরুর মাতা সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই মেয়ের হাত

দেখাইতেন, আর বলিতেন “মেয়েটি কেমনঘরে পড়বে বল্‌তে পার বাবা?” যে যেমন পূজা পাইত, সে ঠিক সেই ওজনে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া যাইত; কেহ বলিত, তোমার মেয়ে রাজরাণী হইবে; আবার কেহবা বলিত, তোমার মেয়ে সুখে থাকিবে।

দেখিতে দেখিতে নিরু বারবছরে পড়িল, তখন তাহার মা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে ঘটক আসিতে লাগিল, কিন্তু কোন সম্বন্ধই নিরুর পিতার পছন্দ হইলনা। নিরুর মাতা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন “মেয়ের বরাতে যা আছে তা হবেই, আমি কি করবো বল?” অনেকদিন পরে জগৎপুরের রাজবাড়ী হইতে নিরুর সম্বন্ধ আসিল, পাত্রপক্ষ কন্যা পছন্দ করিয়া গেল, নিরুর পিতারও বর পছন্দ হইল। মেয়ে রাজরাণী হইবে ইহাতে কোন্ পিতার আপত্তি থাকে। নিরুর মাতার ইহাতে বিশেষ আপত্তি থাকিলেও তিনি মেয়ের অকল্যাণের ভয়ে প্রকাশ্যে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার ইচ্ছাছিল যে, সমানঘরে মেয়ের বিবাহ হয়, কারণ তাহা হইলে নিরু কখন কখনও বাপের বাড়ী আসিয়া থাকিতে পারিবে, মেয়েজামাই লইয়া সাধ আহ্লাদ করিতে পাইবেন। তাই একদিন মুখ ফুটিয়া স্বামীকে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন “দেখ, রাজবাড়ীতে নিরুর বিয়ে হলে সময় অসময় আন্‌তে পারব না, হয়ত মরবার সময় একবার চোখেও দেখতে পাব না।” নিরুর পিতা উত্তর করিলেন “এই জন্যই বলে বারহাত কাপড়ে মেয়েমানুষের কাছা নাই। নিরু যদি রাজরাণী হয় তাহলে কি তোমার মরণের সময় রক্ষা থাক্‌বে! জগৎপুর শুদ্ধ তোমার এই বাড়ীর উঠানে এসে বস্‌বে।”

মেয়ের মার কোন আপত্তিই টিঁকিল না, মহা ধূমধামে নিরুর বিবাহ হইয়াগেল, নিরু শ্বশুরালয়ে চলিয়াগেল। বউ বড় হইয়াছে; বাপের বাড়ী থাকিলে ছেলের ঘরে মন বসিবে না, এই আছলা করিয়া নিরুর শ্বাশুড়ী দ্বিরাগমনের পরে তাহাকে আর পিত্রালয়ে যাইতে দিলেন না। নিরুর পিতা দুই একবার লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু বৈবাহিকার নিকট কটুকথা শুনিয়া ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছিলেন। তাঁহার বৈবাহিক বলিতেন যে "জগৎপুরের রাজবাড়ীর বধূকে কেহ কখনও পিত্রালয়ে যাইতে দেখে নাই।" যৌবনোদ্গমে নিরুপমার বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের জল গায়ে লাগিয়া পূর্ণবিকশিত চম্পক কলিকার ন্যায় তাহার রূপ ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি যাহার অধিকারে আসিয়াছিল, সে তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। শ্বশুর শ্বাশুড়ী যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন নিরুপমা বিশেষ কোনও অভাব বুঝিতে পারে নাই। স্বামীকে সে বড় ভয় করিত, সুতরাং তাঁহার নিকটেও যাইতনা। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করিয়া তাহার দিন কাটিত। শ্বাশুড়ী সময়ে সময়ে দুঃখ করিয়া বলিতেন "পোড়াকপালীর রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে। আহা আর জন্মে কি পাপ করিয়াছিল যে তাহার ফলে ছেলের মনের মত হইল না।" নিরুপমা সে সব বড় বুঝিতনা, কেবল পিত্রালয়ে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

জগৎপুরের রাজপুত্রের নাম শ্যামাদাস। তিনি বাল্যকাল হইতে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় থাকিতেন, ছুটির সময় বাড়ীতে আসিতেন। কুমার শ্যামাদাস উচ্চশিক্ষিত। ধনী সন্তানের সচরাচর যাহা হয়না, কুমারের তাহাই হইয়াছিল, তিনি সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। স্কুলে কলেজে

শিক্ষা শেষ হইলেও তিনি লেখাপড়ার চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন নাই এবং সেই ওজর করিয়া তিনি বাড়ীতে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহার পিতা মাতা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারেন নাই। পুত্রের চরিত্র দোষ ছিলনা বলিয়া পিতা পুত্রের কলিকাতায় থাকা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিতেন না, তিনি ভাবিয়াছিলেন কালে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বেই কালপ্রাপ্ত দেখিয়া কাল আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গেল। শ্বশুর মরিলেও নিরুপমা বিশেষ অভাব বোধ করে নাই, কিন্তু শ্বাশুড়ী মরিলে সে অকূল পাথারে পড়িল, কারণ সে তখন বৃহৎ রাজ-সংসারের কর্ত্রী হইয়া উঠিল, তখন সে দেখিল যে তাহার বিষম বিপদ। যাঁহা্র বিষয় যাঁহার সম্পত্তি, তিনি কলিকাতায় থাকেন, দেশে সকলে তাহারই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। দেবতার সেবা, ক্রিয়াকর্ম্ম সকল বিষয়ে, সকলেই তাহার হুকুম লইতে আসে। সে মহাবিপদে পড়িয়া যায়। ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চায়, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করে, দেওয়ান আসিয়া বলে "মহারাণীর কি হুকুম?" নিরুপমা ভাবে আমি কে? ইহারা আমাকে কেন জ্বালাতন করিতে আসে? উত্তর না পাইয়া দেওয়ান ফিরিয়া যাইত; ভিখারী, আর্ত্ত,, দরিদ্র বিফল হইয়া চলিয়া যাইত নিরুপমা কোন কথাই বলে না।

যাঁহার ঘর বাড়ী, যাঁহার বিষয় সম্পত্তি, তিনি চাহিয়াও দেখেন না। নিরুপমা ভাবিয়া কুল পাইল না। গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া পুরাতন দেওয়ান অবসর চাহিল। রাজা কলিকাতা হইতে টাকা চাহিয়া পাঠাইলে দেওয়ান জবাব দিল; বলিয়া পাঠাইল, সে বৃদ্ধ হইয়াছে, কার্য্যে অক্ষম। তখন বাধ্য হইয়া নিরুপমার স্বামীকে দেশে ফিরিতে হইল, স্বামী আসিলে

সে তাঁহার দেখা পাইল না। তবে শ্বাশুড়ী থাকিতে তাহাকে বাধ্য হইয়া প্রসাধন করিতে হইত, এবারে তাহাও হইল না।

রাজা দেশে ফিরিয়া সকলকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। দাসী আসিয়া নিরুপমাকে বলিয়া গেল, "মহারাণী, মহারাজের হুকুম হইয়াছে সকলকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।" নিরুপমা উত্তর করিল "মহারাজকে গিয়া বল আমি যাইতে পারিব না। আমি গেলে দেবসেবা হইবে না।" নিরুপমা স্বামীকে বড়ই ভয় করিত, তথাপি সাহস করিয়া এত বড় একটা কথা বলিয়া ফেলিল। দাসী উত্তর শুনিয়া চমকাইয়া গেল, কিন্তু সে কি করিবে, সেই উত্তর লইয়াই ফিরিল। মরণ সময়ে নিরুপমার শ্বাশুড়ী বলিয়া গিয়াছিলেন "মা, আমিত চলিলাম। শ্যামা-দাসের ভাবগতিক দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে, বরাতে ভগবান যে কি লিখিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন কখনও গোপালের সেবা ভুলিও না। গোপাল অবশ্যই একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।" গোপাল জগৎপুর রাজবংশের গৃহ-দেবতা। নিরুপমা জানিত শ্বাশুড়ীর চাইতে আপনার তাহার আর কেহই নাই, সেই জন্যই সে বলিয়াছিল, সে কলিকাতায় যাইবে না। কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিকিলনা, রাজা বলিয়া পাঠাইলেন যে গোপালও কলিকাতায় যাইবেন। নিরুপমা আর কোনও উত্তর করিলনা, কলিকাতায় যাওয়াই স্থির হইল। দাসদাসীআত্মীয়গণ জিনিষ পত্র গুছাইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় জগৎপুরের রাজা প্রকাণ্ড বাড়ী করিয়াছেন, তিন মহল বাড়ী, সদর বাড়ীতে রাজা বাস করেন, দ্বিতীয় মহলে ঠাকুর বাড়ী, অন্দর

মহলে নিরুপমা থাকে। রাজা কখনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন না, কিন্তু দেবসেবা বা অন্দর-মহলের কোন ব্যবস্থার অভাব নাই। প্রত্যেক মহলের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে, স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাহারা নিরুপমার আদেশে দেবসেবা ও অন্দরমহলের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। নিরুপমা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এতদিনে সে নিশ্চিন্ত হইল।

বহুদিন মেয়েটিকে না দেখিয়া নিরুপমার মাতা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে জামাই এখন রাজা হইয়াছে, মেয়ে এখন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, এখন চেষ্টা করিলেই মেয়েটিকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও স্বামীকে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিলেন না। অবশেষে তাহার কাঁদাকাটিতে জ্বালাতন হইয়া নিরুপমার পিতা চূড়ামণি যোগে পত্নীকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় যাইতে সম্মত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া, একবার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উভয়েই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেক বাক্‌-বিতণ্ডার পরে স্থির করিলেন যে নিরুপমার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসাই ভাল।

একদিন অপরাহ্নে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী কলিকাতায় জগৎপুরের রাজবাড়ীর ফটকে প্রবেশ করিল, গাড়ীতে স্ত্রীলোক দেখিয়া সদর বাড়ীর লোকে গাড়ী অন্দরে পাঠাইয়া দিল, নিরুপমার পিতা সদরে বসিয়া রহিলেন। নিরুপমার মাতা গাড়ী হইতে নামিয়া লোকজন দেখিতে না পাইয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন দাসী আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা থেকে আসছ'গা ?" নিরুপমার মাতা গ্রামের নাম করিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল "তবে বুঝি

তুমি রাণীমার বাপের বাড়ী থেকে আসছ ? আহা !”, আশঙ্কায় মাতার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের রাণীমা ভাল আছে ত ?”

দাসী। তাঁরত ভাল মন্দ সবই সমান। আহা, এমন লোকেরও এমন হয়।

মাতা। কেন গো, কি হয়েছে ?

দাসী। তোমরা কি রাণীমার কোন খোঁজই রাখ না ?

মাতা। তুমি একবার আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

দাসী অগ্রসর হইয়া চলিল, নিরুপমার মাতা অন্দরমহলে নিরুপমার দেখা পাইলেন না, ঠাকুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, নিরুপমা একখানি মোটা তসরের সাড়ী পরিয়া গোপালের ভোগ রাঁধিতেছে, সোনার বরণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তৈলাভাবে রুক্ষ কেশরাশি বাতাসে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কন্যার আকৃতি দেখিয়া মাতার নয়নে জল আসিল। তিনি দূরে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন “নিরু!” বহুদিন পরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া নিরুপমা চমকাইয়া উঠিল, হাঁড়ী নামাইয়া বাহির হইয়া আসিল, একবার “মা” বলিয়া ডাকিয়া মাতার কণ্ঠলগ্না হইল। দশবৎসর পরে মাতা-পুত্রীর মিলন হইল, অশ্রুজলে উভয়ের গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল, মাতা কাঁদিলেন কন্যার অবস্থা দেখিয়া, কন্যা কাঁদিল মাতাকে দেখিয়া আনন্দে। মা কেন কাঁদিতেছেন নিরুপমা তাহা বুঝিতে পারিলনা, সে ভাবিল যে তাহার মাতাও আনন্দে কাঁদিতেছেন। মাতা ভাবিয়াছিলেন কন্যা রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে, তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবেন। কিন্তু নিরাভরণা বেদনাক্লিষ্টা কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার উল্লাস দুঃখে পরিণত হইল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া উভয়ে শান্তি লাভ করিলেন। দেবসেবা

শেষ হইল, নিরুপমা প্রসাদ লইয়া আহারে বসিল। সামান্য দাসীর ন্যায় সামান্য পাত্রে, অন্যান্য মহিলাগণের সহিত কন্যাকে আহার করিতে দেখিয়া মাতার নয়ন আবার জলে ভরিয়া আসিল, কিন্তু কন্যা মনে ব্যথা পাইবে বলিয়া মনের কথা প্রকাশ করিলেন না।

আহার করিয়া মাতাকে লইয়া নিরুপমা অন্দরমহলে ফিরিল। মাতা দেখিলেন যে অন্দরমহলে বহুমূল্য সাজসজ্জার কোনই অভাব নাই। নিরুপমা শয়ন-কক্ষের বাহিরে একখানি মাদুর পাতিয়া বসিল, তাহার মাতা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন যে সুসজ্জিত বহুমূল্য আসবাবে শয়ন কক্ষটি পরিপূর্ণ, কিন্তু কেহ যেন তাহা ব্যবহার করে না। নিরুপমা মাদুরের উপরে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। একজন দাসী তাহাকে বাতাস দিতে আসিল, সে তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল, তাহা দেখিয়া তাহার মাতার হৃদয় আরও আকুল হইয়া উঠিল। রাণীমায় মা আসিয়াছেন শুনিয়া অন্দর মহলের সকলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল। নিরুপমার মাতা তাহাদিগের নিকট একটি একটি করিয়া সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এমন ভুবনমোহিনী রূপের দিকে রাজা কখনও চাহিয়াও দেখেন না, পথ ভুলিয়াও কখন অন্দরমহলে আসেন না, পত্নীকে কখনও একটি মিষ্ট কথাও বলেন না। এই সকল কথা শুনিয়া, নিরুপমার মাতা পাগল হইয়া উঠিলেন। কন্যার গৃহ তাঁহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল তিনি নিরুপমার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলেন। আসিবার সময় কন্যা মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা আবার আসিও," মাতাও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আসিব বই কি মা, আবার আসিব।"

সোণার বালা।

প্রথমে রাজা শ্যামাদাসের চরিত্র-দোষ ছিলনা, কিন্তু কুসংসর্গে পড়িয়া রাজা ক্রমশঃ চরিত্রহীন হইলেন, সে কথা নিরুপমার কর্ণে পৌছিতে বাকি রহিলনা। স্বামী কাহাকে বলে তাহা সে জানিতনা, স্বামীকে সে চিনিতে পারে নাই, তথাপি সে হৃদয়ে বেদনা বোধ করিল। বড় হইয়া সংসারের কথা সে কতকটা বুঝিয়াছিল, তাহার প্রাপ্য হইতে যে সে বঞ্চিত হইয়াছে সে তাহা বুঝিয়াছিল। চারিদিকে সুখদুঃখ মিশ্রিত সংসারে কত শত শত ভাগ্যবতী স্বামীপুত্র লইয়া ঘর করিতেছে, তাহা দেখিয়া অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিত, অপরিসীম যন্ত্রণায় তাহার ক্ষুদ্র নারীহৃদয় ফাটিয়া যাইত বটে, কিন্তু তাহার মুখ ফুটিত না। উপায় নাই দেখিয়া সে গোপালের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। সে ভাবিয়া লইল যে গোপাল তাহার পুত্র, তাই সে গোপালের বেশভূষায়, সাজসজ্জায় ও সেবায় দিন কাটাইয়া দিত। অন্দরমহলের ঐশ্বর্য্য তাহার অসহ্য বোধ হইত; তাই সে সমস্ত দিন ঠাকুর-বাড়ীতে কাটাইয়া দিত। রাত্রিতে তাহার সুসজ্জিত শয়ন-কক্ষের এককোণে একখানি মাদুর বা কম্বল পাতিয়া পড়িয়া থাকিত। তথাপি তাহার শয়ন-কক্ষ সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত, শয্যা কোনও দিন অপরিষ্কৃত থাকিলে দাসীগণ তিরস্কৃত হইত। একদিন কে তাহাকে বলিয়াছিল যে রাজা বড় গোলাপ ফুল ভালবাসেন, তাহার পর হইতে বারমাস সুগন্ধী বহুমূল্য গোলাপ ফুলে তাহার ঘরগুলি সাজান থাকিত, সে যেন সর্ব্বদাই কক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার আগমনের অপেক্ষা করিত। তাহার রাশি রাশি বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল, তাহা সে কখনও পরিতনা, দুহাতে দুগাছি সোণার বালা পরিয়া দিন কাটাইয়া দিত।

পাপের স্রোত বড় দ্রুত, তাহাতে গা ঢালিয়া দিলে আর গতিরোধ হয় না। পূর্ব্বে রাজসংসারে অর্থের অভাব ছিলনা, কিন্তু ক্রমশঃ তাহাও হইল, একে একে সমস্ত জমিদারীগুলি বন্ধক পড়িল। অবশেষে বিক্রয় হইয়া গেল। মধুর অভাব হইলে মধুমক্ষিকা থাকে না, শ্যামাদাসের অর্থাভাব দেখিয়া বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। যাহারা চিরকাল জগৎপুরে রাজসংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহারাও ক্রমশঃ ছাড়িয়া গেল। নিরুপমা ক্রমশঃ একা পড়িল। একদিন শ্যামাদাসের মনে পড়িল যে,নিরুপমার বহুমূল্য অলঙ্কার আছে। রাজা ধীরে ধীরে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, যে দুই একজন দাসদাসী ছিল তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "রাণী কোথায়?" একজন দাসী তাঁহাকে নিরুপমার শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিল, সে তখন গৃহের এক কোণে মাদুরের উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দাসী তাঁহাকে ডাকিয়া দিতে গেল, কিন্তু রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন, দাসী পলাইল। কক্ষে খাটের উপর বসিয়া রাজা ডাকিলেন "নিরুপমা," জীবনে তাঁহার এই প্রথম পত্নী-সম্ভাষণ। ডাক শুনিয়া নিরুপমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। উঠিয়াই স্বামীকে দেখিতে পাইল এবং এক হাত ঘোমটা টানিয়া কোণে গিয়া দাঁড়াইল। রাজা আবার ডাকিলেন "নিরুপমা?" নিরুপমা উত্তর দিলনা। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজা বলিলেন "দেখ, বড়ই টাকার দরকার পড়েছে। তোমার গহনাগুলা একবার দিতে পার? আমি দিন কতক পরে আবার ফিরিয়ে দিব।" ঘোমটার ভিতরে বার কতক ঢোক গিলিয়া নিরুপমা বলিল "সে আর এখন আমার নেই। সে সব গোপালকে

দিয়ে দিয়েছি।” রাজা তাহা শুনিয়া হতাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার হাতে কি এখন কিছুই নেই ?” নিরুপমা স্বামীর প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল স্বামী তাহার হাতের দুই গাছা সোণার বালা চাহিতেছেন। সে বলিল “তোমার যদি বড় দরকার হয়ত আমার হাতে দুএক গাছা যা আছে নিয়ে যাও।” রাজা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তিনি বলিলেন “কই দাও ?” নিরুপমা বলিল “মার কাছে শুনেছি এয়োস্ত্রীর হাত খালি করতে নাই। তুমি আমার হাতে দুগাছি সূতা বেঁধে দাও, আমি খুলে দিচ্চি।” কোথা হইতে একটু লাল সূতা লইয়া নিরুপমা স্বামীর নিকটে সরিয়া গেল, রাজা তাহার হাত দুইখানি লইয়া তাহাতে সূতা বাঁধিয়া দিলেন, নিরুপমা নীরবে বালা দুই গাছি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। রাজা বাহিরে চলিয়া গেলেন, নিরুপমা মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সদরে যাইতে যাইতে রাজা বালা দুগাছি দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিরুপমার বহুমূল্য অলঙ্কারের লোভে আসিয়াছিলেন ; তাহা না পাইয়া তাঁহার একটু রাগও হইয়াছিল ; কিন্তু নিরুপমা যে ভাবে বালা দুই গাছি খুলিয়া দিল তাহা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, সামান্য দুগাছি সোণার বালা, তাহাতে তাঁহার কতক্ষণের খরচ চলিবে ? হঠাৎ মস্তিষ্কের কোন নিভৃত কোণ হইতে উচ্চশিক্ষার লুক্কায়িত প্রভাব আসিয়া রাজার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল। তিনি ভাবিলেন, আমি জগৎপুরের রাজা, সুশিক্ষিত, মূর্খ নহি। আমি কি করিতেছি ? পিতৃকুলের যথা-সর্ব্বস্ব উড়াইয়া দিয়া, যে স্ত্রীর

কখনও মুখ দর্শন করি নাই, শেষে তাহার হস্তের অলঙ্কার লইয়া নিজের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইতেছি। রাজা দাঁড়াইলেন, আর সদরে যাওয়া হইলনা। অন্দরে ফিরিলেন, দেখিলেন নিরাভরণা দেবী মূর্ত্তি লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে। আকুল কণ্ঠে রাজা ডাকিলেন "নিরুপমা" ? নিরুপমা মুখ তুলিল, দেখিল দুয়ারে স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষকেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে স্থির নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিল। সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য, তাহার পর সে স্বামীর বাহু পাশে আবদ্ধ হইল, সে ছিন্না ব্রততীর ন্যায় স্বামীর বুকে লুটাইয়া পড়িল।

বশীকরণ

বিবাহ না করিয়াও পুলিন যখন জগতে বিবাহিত জীবনের অসারতা বুঝিতে পারিল, তখন মানব-জগতে এই নূতন সত্য প্রচার করিবার জন্য সে একটি সভা স্থাপন করিল। বিশ্বনিন্দুকগণ সেই সভার নাম রাখিয়াছিল "চিরকুমার সভা"।

পুলিন স্বয়ং এই সভার সম্পাদক, তাহার সহপাঠিগণের দলে যাঁহারা অবিবাহিত ছিল, তাহারা সকলেই এই সভার সদস্য। ক্ষীণকায়, দুরারোগ্য উদরাময়রোগগ্রস্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অবশ্য তিনিও, অবিবাহিত। বিবাহিত অধ্যাপকের দল ও পুলিনের সহপাঠিগণের মধ্যে যাঁহারা ইহারই মধ্যে বিবাহরূপ কলঙ্ক কালিমা মাখিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্য এ সভায় স্থান পাইতেন না। প্রতি শনিবারে কলেজের ছুটির পরে সভার অধিবেশন হইত। অধিবেশনে বিবাহিত জীবনের অসারতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া পুলিন ও প্রবোধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহারা যখন বিবাহ-প্রথাকে দেশের সকল দুঃখের কারণ বলিয়া দোষ দিয়া সভা গৃহ কাঁপাইয়া তুলিত, তখন বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রবেশ লাভে বঞ্চিত বিবাহিত যুবকবৃন্দও কাঁপিয়া উঠিত।

এক বৎসর কাল সভাটি বেশ চলিল; বিবাহযোগ্যা কন্যাভারগ্রস্ত

অভিভাবকগণ ভাবিয়া কুলকিনারা পাইল না। তাহারা বোধ হয় একমনে ভগবানকে ডাকিয়াছিল, কারণ এক বৎসর যাইতে না যাইতেই নিরুপায়ের উপায় স্বয়ং পথ দেখাইয়া দিলেন। বৎসরের শেষে বার্ষিক অধিবেশনের দিনে সভার একজন বিশিষ্ট সভ্যকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলনা। গ্রীষ্মের ছুটির পরে এই সভ্যটিকে নীরবে বিবাহিতের দলে মিশিয়া যাইতে দেখিয়া পুলিন ও প্রবোধ ক্রোধে ও ক্ষোভে পাগল হইয়া উঠিল। সভার দিনে ভারতের ইতিহাস হইতে বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া পুলিন যখন সেই তালিকার শেষে এই সভ্যের নামটি যোগ করিয়া দিল, তখন করতালির ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। এই নূতন বিশ্বাসঘাতকটি যদি তাহা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে হয় তো মাটিতে মিশিয়া যাইত, না হয় নিজের মস্তকে বজ্রাঘাত প্রার্থনা করিত।

কিন্তু পুলিন ও প্রবোধের ওজস্বিনী বক্তৃতা সত্ত্বেও সভার সভ্যসংখ্যা কমিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতক নীচাশয় কন্যাকর্ত্তার দল ও অর্থলোলুপ অপরিণামদর্শী বরকর্ত্তাগণ একে একে এই নূতন চিরকুমার সভার সভ্যগুলিকে ভাঙ্গাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। বক্তৃতা করিয়া পুলিন ও প্রবোধের গলা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল, সভাগৃহের অনেকগুলি টেবিল ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাহাসত্ত্বেও সভ্যসংখ্যা কমিতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী উপাধি পাইয়া পুলিন যখন নূতন উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন সভার অবস্থা দেখিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে কন্যাদায়প্রপীড়িতদুর্ব্বৃত্তগণ সভার সভ্যসংখ্যা হ্রাস করিতে লাগিল, দুই একজন নূতন সভ্য আসিল বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতির

শতাংশের এক অংশও পূরণ হইল না। এম্-এ পরীক্ষা দিয়া পুলিন যখন দেশে ফিরিল তখন সভার সভ্য সংখ্যা মাত্র পাঁচজন।

পুত্রের মন ভারি দেখিয়া পুলিনের মাতা যখন স্বামীর নিকটে পুলিনের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, তখন পুলিনের পিতা শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন "সর্ব্বনাশ, তুমি ছেলেটিকে ঘরে রাখিতে দিবেনা দেখিতেছি। তোমার পুত্র যে জগৎ উদ্ধার করিবার জন্য চিরকুমার সভা স্থাপন করিয়াছে। সেকি কখনও বিবাহ করিতে পারে?" পুলিনের যশঃ কলিকাতা ছাড়াইয়া সুদূর পল্লীগ্রামেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহার মাতা কিন্তু তাহা বুঝিলেন না, তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া পুলিনের পিতা বলিলেন "তুমি যদি ছেলের মত করাইতে পার তাহা হইলে তাহার বিবাহ দিতে আমার বিন্দু মাত্রও আপত্তি নাই।" বিজয়োল্লাসে মাতা যখন পুত্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন পুলিন অন্নহীনতা, শিশুমড়ক এবং আরও কত, কি দুর্ব্বোধ্য কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাক করিয়া দিল, তিনি পলাইতে পথ পাইলেন না।

মায়ের মন কিন্তু বুঝেনা, পুত্র যখন চিরকুমার সভার ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল, মাতা তখন গোপনে গোপনে সুন্দরীকন্যার অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আইন পড়িতে কলিকাতায় আসিয়া পুলিন একটী ঘোর দুঃসংবাদ শুনিয়া বসিয়া পড়িল। বিবাহিতের দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শুনাইল যে প্রবোধ বিবাহ করিয়াছে। সুমেরু পর্ব্বত যদি মক্ষিকায় নাড়িত, শিলা যদি জলে ভাসিয়া যাইত, বানরে যদি সঙ্গীত গাহিত, তাহা হইলেও পুলিন বোধ হয় এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইতনা। যে প্রবোধ তাহার দক্ষিণ

হস্ত, যে প্রবোধ বলিয়াছিল সে স্ত্রীজাতিকে কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় ঘৃণা করে, যে প্রবোধ তাহার ভারত-যুদ্ধে মধ্যম পাণ্ডব, সেই প্রবোধের এই কাজ! বিবাহিতের দল তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। পুলিন বহুকষ্টে তাহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া দেখিল সম্মুখেই প্রবোধ। কিন্তু প্রবোধ যখন তাহাকে দেখিয়া সলজ্জভাবে নতদৃষ্টিতে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, তখন তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না।

রাগে, লজ্জায় অপমানে পুলিন যেন কেমনতর হইয়া গেল সে কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবিত যে মূঢ় মানব তাহার উচ্চ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না, সকলে মিলিয়া তাহার জীবনের ব্রত পণ্ড করিয়া দিল। সে স্থির করিল সে নিজে জগতের আদর্শ হইয়া থাকিবে, কখনও স্ত্রীজাতির ছায়া মাড়াইবেনা।

২

অসভ্য জগৎ যেমন ভাবে চলিতেছিল্ ঠিক তেমনি ভাবেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পুলিনের উচ্চ আদর্শ মূঢ় মানবকে মোহ মুক্ত করিতে পারিলনা। দেখিয়া শুনিয়া মানুষের উপরে পুলিনের একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া গেল, তাহার আইন পড়া আর শেষ হইলনা; সে মফস্বলের একটি কলেজে চাকরী লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল। পুলিন পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাহার পিতা নব্য তন্ত্রে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াও প্রাচীন শিক্ষার প্রভাব একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এক মাত্র পুত্র সেও বিবাহ করিলনা; বংশ লোপ হইবে, পিণ্ডলোপ হইবে, পিতৃ-পিতামহের ভিটায় সন্ধ্যাকালে দীপ জ্বলিবেনা, এই চিন্তা শেষ বয়সে

তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। পুলিনের মাতা সর্ব্বদা চোখের জলে ভাসিতেন, তাঁহার দশা দেখিয়া পুলিনের পিতা আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

গ্রীষ্মাবকাশে পুলিন কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে ফিরিল, তখন তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন। পুলিন মাতার চোখের জল গ্রাহ্য করে নাই; কিন্তু পিতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে পারিলনা। তিনি যখন কাতর কণ্ঠে প্রাচীন বংশ লোপ ও পিতৃ-পিতামহের পিণ্ডলোপের আশু সম্ভাবনা জানাইলেন, তখন পুলিন নীরবে শুনিয়া গেল। তাহার মনে যাহাই থাকুক না কেন, প্রকাশ্যে সে কোন আপত্তি করিতে পারিল না। পুলিন বিবাহ করিবে এই সংবাদ নক্ষত্রবেগে বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিল, নানাদেশ হইতে চিরকুমার সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ উপহার পাঠাইতে লাগিল। পুলিনের কিন্তু অনুতাপ বা লজ্জার চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল যে সে পিতার আদেশ পালন করিবে বটে, কিন্তু তথাপি জগতের আদর্শ হইয়া থাকিবে। সে বিবাহ করিবে কিন্তু স্ত্রীর মুখ দর্শন করিবেনা।

মহাসমারোহে কলিকাতায় পুলিনের বিবাহ লইয়া গেল। প্রবোধ, নরেশ প্রভৃতি পুলিনের ভূতপূর্ব্ব সহচরগণ একত্র হইয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিল; কেহ বলিল এতদিনে মহাপুরুষের পতন হইল; কেহ বলিল কন্যা-কর্ত্তাদের উৎপাতে বাঙ্গালা দেশে আর সাধু পুরুষ রহিল না; কেহ বলিল পুলিন দেওয়ালে লিখিয়া রাখিয়াছিল যে এইবার ডাকিলেই যাইব। প্রবোধের স্ত্রী বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহাপুরুষদিগকে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই জানাছিল, তবে কেহ বা দুদিন আগে, কেহবা দুদিন

পরে ধরাদিল। পুলিন নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া গেল। বিবাহের দিনে চিরকুমার সভার অধঃপতনের কারণ গুলি মূর্ত্তিমতী হইয়া বরের গৃহে দেখা দিলেন। সভার বাঁধা গৎগুলি প্রবোধের স্ত্রীর আগাগোড়া মুখস্থ ছিল, তিনি মহিলা সভায় তাহা আওড়াইয়া বিবাহ-বাড়ী কোমলকলহাস্যে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। পুলিন তখন মনে মনে ভাবিতেছিল যে ক্ষুদ্রচেতা নরনারীগুলি জগতের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহারা তাহা বুঝিতেছেনা। এইরূপে মহাপুরুষের কৌমারব্রত ভঙ্গ হইল।

বিবাহের পরে দুইবৎসর কাটিয়াগেল, পুলিনের পিতা পুত্রের বিবাহ দিয়া অধিকতর বিপদে পড়িলেন। বিবাহের পরে যখন বধূ ঘরে আসিল, তখন পুত্র আর ঘরে আসিতে চাহিলনা। বৃদ্ধ পুত্রবধূ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পুলিনের স্ত্রীর নাম বিভা, সে সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও গুণশালিনী। বিবাহের সময় তাহার বয়স হইয়াছিল, সে নিতান্ত বালিকা ছিলনা, সে পতির অনাদরের কারণ বুঝিতনা বটে কিন্তু আদরের অভাব বুঝিত। বুঝিয়া সে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিত, তাহার সেই করুণ ভাবটি শ্বশুর শ্বশ্রূর বুকে সর্ব্বদা শেলের মত বিঁধিয়া থাকিত। বৃদ্ধ বৃদ্ধা উপায় না দেখিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতেন, তাই অগতির গতি প্রসন্ন হইয়া পথভ্রান্তের পথনির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

শোভা সম্পর্কে বিভার বড় বোন, বিভার বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শোভা বড়ই রহস্যপ্রিয়া, বাড়ীতে তাহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতনা। বিভার বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে শোভা স্বামীর সহিত বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল, এবং বিভার বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই বলিয়া কত দুঃখ করিয়া চিঠি

লিখিয়াছিল। বিভার ভবিষ্যৎ মালিককেও এক খানা পত্র লিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে কাব্যের উৎস পুলিনের নীরস মরুভূমিতে পড়িবামাত্র শুকাইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে ভগবান অগতির গতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য শোভাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

শোভা দেশে ফিরিয়া শুনিল যে বিভা শ্বশুর গৃহে। বিভার মাতার মুখে সে বাল্যসখীর দুরদৃষ্টের কথা শুনিয়া তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনুরোধে বিভার মাতা বিভাকে আনিতে পাঠাইলেন, পুলিনের পিতা বাক্যব্যয় না করিয়া বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। দীনা, মলিনা পুত্রবধূর মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বিভা পিত্রালয়ে আসিল, দুই সখীতে মিলন হইল, শোভা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু উত্তর পাইলনা, কারণ বিভা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

শোভা ছাড়িবার পাত্রী নহে, সে নানা উপায়ে সখীর মনের গোপন কথাগুলি জানিয়া লইল। সমস্ত জানিয়া সে বিভাকে অভয় দিয়া বলিল "তোর কোন ভয় নাই, আমি এর বিহিত করিব।" বিভা আশ্বাস পাইয়া আশায় বুক বাঁধিল।

(৩)

শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র মহলে পুলিনের খুব প্রশংসা হইয়াছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বেতন বৃদ্ধি হইল, সে পাটনায় বদলী হইল। শোভা যখন দেশে ফিরিল, পুলিন তখন পাটনায়। পাটনায় একটি সুন্দর ছোট বাঙ্গলায় পুলিনের বাস। সে কাহারও সহিত

মিশিত না, আপনার পড়া-শুনা ও কলেজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। সুতরাং একদিন সকালে তাহার ভৃত্য যখন আসিয়া সংবাদ দিল যে একটি ভদ্রলোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তখন সে বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে নীলবর্ণের চশমা-ধারী একটি ভদ্রলোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পুলিনকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন "এই যে, আপনারই নাম পুলিন বাবু? আমার নাম শ্রীনিশীথনাথ ঘোষাল। মহাশয়ের সহিত আমার সম্পর্ক বড়ই নিকট। আমার স্বামিনী মহামহিমান্বিতা শ্রীল শ্রীযুক্তা শোভনা-দেবীর খাস-সখী, এবং খুল্লতাতপুত্রী শ্রীযুক্তা বিভাদেবীর সহিত আপনার বিবাহ হইয়াছে। শ্রীমতীর আদেশে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমরা সম্প্রতি পাটনায় আসিয়াছি, উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য সংস্কার। মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছাটা বড়ই বলবতী ছিল।" এই কথা কয়টি শুনিয়া পুলিন হাড়ে চটিয়া গেল। লোকটির কথাবার্ত্তা হাবভাব সমস্তই যেন বিদ্রূপব্যঞ্জক কিন্তু কথাগুলি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে অথচ হাসি-মুখে বলা। সে ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল "বসুন, চা খাবেন কি?" ভদ্রলোকটি এক গাল হাসিয়া উত্তর করিলেন "চা না খাওয়াইয়া শ্রীমতী কি আমাকে এতদূর আসিতে দিয়াছেন? আমার যে কাহিল শরীর?" কথা শুনিয়া পুলিন হাসিয়া ফেলিল। কারণ আগন্তুকের ঈষৎ স্থূল দেহে দুর্ব্বলতার চিহ্ন মাত্র দেখা যাইতেছিলনা। তিনি বোধ হয় পুলিনের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন কারণ তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমার শরীর দেখিয়া ভাবিবেন না যে আমি বড় বলবান্, তিল তিল

করিয়া, দিন দিন আমার শরীরটি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। সেই জন্যইত বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিয়াছি। আপনার বাড়ীতে কি তামাকের বন্দোবস্ত আছে?"

পুলিন অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "না।"

নিশীথ। থাক, আমার পকেটে সিগারেট আছে। আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

পুলিন বসিয়া পড়িল, তাহার বড়ই জ্বালাতন বোধ হইতেছিল, নিশীথ বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন "এই দারুণ গ্রীষ্মে, এবং এই কাট-ফাটা রৌদ্রে, এবং বিশেষতঃ এই দুর্ব্বল শরীরে শ্রীমতী যে বিনা কারণে আমাকে এতদূর পাঠান নাই, তাহা আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন।"

পুলিন। কি কারণ?

নিশীথ। আপনার বিবাহের সময় আমরা বিদেশে ছিলাম। শ্রীমতী আপনাকে দেখেন নাই বলিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন।

পুলিন। তিনি কি এখানে আসিয়াছেন?

নিশীথ। তিনি না আসিলে আমি কি এখানে আসিতে পারিতাম?

পুলিন। আপনারা কোথায় আছেন?

নিশীথ। এই বড় রাস্তার মোড়ের উপরে; শ্রীমতীর আদেশ যে আজ রাত্রে আপনি দীনের কুটীরে পদার্পণ করবেন।

পুলিন। কলেজ থেকে ফিরিবার সময় দেখা করে এলে হ'তনা?

নিশীথ। সর্ব্বনাশ, তাহলে কি আমার রক্ষা থাকবে? মহাশয় মাপ

করুন; এই দুর্ব্বল অবস্থায় পারিবারিক শান্তিভঙ্গের কল্পনা করিলেও আমার মাথা ঘুরিতে থাকে।

পুলিন নিরুপায় হইয়া বলিল "আচ্ছা যাব।"

সন্ধ্যার সময়ে পুলিন নিশীথ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইল। সে দেখিল বাঙ্গালাটি সুন্দর সাজান, দু একদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়া লোকে যে এমন ভাবে থাকিতে পারে তাহা পুলিনের কল্পনাতীত। তাহাকে দেখিয়া একজন বেহারা বাড়ীর ভিতরে খবর দিতে গেল। অবিলম্বে নিশীথ বাবু তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন "আসুন আসুন, আপনাকে দেখে আমার দেহে প্রাণ ফিরে এল। আর একটু বিলম্ব হইলেই গরীবের চাকরীটি যেত আর কি?

পুলিন। থাক, আমি বাহিরেই বসি!

নিশীথ। মহাশয়, তা'হলে আমার কাঁচা মাথাটী এখুনি উড়ে যাবে।

পুলিন অগত্যা উঠিল, উঠিবার সময়ে মনে মনে ভাবিল নিশীথ বাবু বড়ই স্ত্রৈণ, এমন স্ত্রৈণ লোকত সচরাচর দেখা যায় না। সে বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিল যে অন্দরটিও পরিপাটিরূপে সাজান। সেই সময়ে বলয়কঙ্কণগুঞ্জনে কক্ষটি মাতাইয়া তুলিয়া নিশীথ বাবুর শ্রীমতী প্রবেশ করিলেন। তিনি পুলিনকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "লজ্জা কি? ভিতরে এসে বস।" পুলিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া শোভা তাহার হাত ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসাইল, পুলিন কলের পুতুলটির মত বসিল। নিশীথ বাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া মুখের ভিতরে কাপড় এবং রুমাল গুঁজিতেছিলেন। আহার শেষ করিয়া পুলিন যখন রাত্রিতে গৃহে ফিরিল

তখন তাহার অজ্ঞাতসারে শ্যালিকার প্রতি অস্ফুট প্রীতির ভাব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিশীথ বাবুর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাবটিও কমিয়া আসিতেছিল।

৪

শোভা দেবীর তূণে বশীকরণের যে কয়টি অমোঘ অব্যর্থ অস্ত্র ছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার রন্ধন বিদ্যাটি অন্যতম। নিশীথ বাবুরা পাটনায় আসিবার পর পুলিনের প্রায় প্রত্যহই তাঁহাদের বাটিতে নিমন্ত্রণ হইত। পুলিন নিমকহারাম নহে। সে সর্ব্বত্র শোভার রন্ধনের প্রশংসা করিয়া বেড়াইত। এইরূপে শোভা ও নিশীথ বাবুর সহিত পুলিনের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল। কিছুদিন পরে শোভা যখন প্রস্তাব করিল যে, পুলিন বাসা উঠাইয়া দিয়া তাহাদিগের সহিত আসিয়া থাকুক, তখন কৃতজ্ঞ লবণভোজী পুলিন, নিশীথ বাবুর শ্রীমতীর আদেশ, অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। পাটনার পাচকের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুলিন বাঁচিয়া গেল, অল্প দিনের মধ্যে তাহার শ্রী ফিরিয়া গেল, রুক্ষ স্বভাব অনেকটা কোমল হইয়া আসিল।

একদিন প্রভাতে শোভা পুলিনকে বলিল "ওগো গাঙ্গুলী মশাই, নূতন খবরটা শুনেছ ? দেশ থেকে আমার খুড়িমা আর আমার একটি বোন হাওয়া খেতে পাটনায় আসছে। বাড়ীটা এতদিন খালি খালি ঠেকতো ; এইবারে গুলজার হবে।" পুলিন অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল "এইবারে তা হলে আমি একটা বাসা ঠিক করে নিই ? আমি থাকলে তাঁদের অসুবিধা হবে।" শোভা হাসিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিল।

সে বলিল "ঘোষাল মশায়ের মত তুমিও কি একটি সঙ্ নাকি ? তিনিত শাশুড়ী আসছে বলে এখন থেকেই জড় সড় হচ্ছেন।"

পুলিন। আপনার ভগিনীও ত আসছেন ?

শোভা। এলেই বা, সেত আর তোমার ঘাড়ে পড়বে না, আমার বোন অত লাজুক নয়।

পুলিন। কেন ?

শোভা। অতশত আমি জানিনা ভাই। তবে মোট কথা তোমার এখান থেকে যাওয়া টাওয়া হচ্ছেনা।

ইহার আর জবাব নাই বুঝিয়া পুলিন মাথাটি নীচু করিয়া কলেজে চলিয়া গেল। দুই তিন দিন পরে বিভা ও বিভার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিন বিবাহের পরে আর শ্বশুরবাড়ী যায় নাই, সুতরাং পত্নী বা শ্বশ্রূকে চিনিতে পারিল না। বিভার মাতা আসিয়া রান্না ঘরে আশ্রয় লইলেন। অন্য ঘরগুলিতে মাদুরের ম্যাটিং কার্পেট-মোড়া বলিয়া অপবিত্র জ্ঞানে তিনি সে দিক্ মাড়াইতেন না। তাঁহারা আসিবার পরে পুলিন দূর হইতে তাঁহাকে একবার প্রণাম করিয়া আসিয়াছিল, তাহার পর আর শ্বশ্রূর সাক্ষাৎ পায় নাই। শোভা বিভার নাম বদলাইয়া দিয়াছিল, অথচ মিল্ থাকিবে বলিয়া তাহাকে প্রভা বলিয়া ডাকিত। শোভার তাড়নায় বিভা পুলিনের সম্মুখে বাহির হইত, কিন্তু সে কোন মতেই ঘোমটা ছাড়িল না। বিভা আসিবার পরে পুলিন দেখিত যে তাহার ঘরটি সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুস্তকের রাশি কে যেন আসিয়া সাজাইয়া দিয়া যায়, তাহার বস্ত্রগুলি মলিন হইলে বদলাইয়া দেয়, কামিজে বা কোর্টে বোতামের

অভাব হয় না। পুলিন কিছুই বুঝিতে পারিতনা, কিন্তু মনে অশান্তির অভাব অনুভব করিত। ইহা তাহার জীবনে নূতন।

শোভা সুযোগ পাইলেই বিভাকে পুলিনের নিকট পাঠাইয়া দিত, ইহাতে বিভা যত না সঙ্কুচিত হউক পুলিন তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সঙ্কুচিত হইত। ইহা দেখিয়া নিশীথ বাবু বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি বলিতেন "কিহে পুলিন ভায়া আছ কেমন? খুড়িমা এসে কোন অসুবিধা হচ্ছে না'ত?" নিরীহ পুলিন একগাল হাসিয়া উত্তর দিত "কষ্ট কি দাদা, আপনার কাছে রাজার হালে আছি। খুড়িমা এসে ব্যঞ্জনের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেছে।" নিশীথ বাবু হাসিতেন ও মনে মনে বলিতেন শোভার ঔষধ ধরিতেছে।

পুলিন অধিক পান খাইত না, কিন্তু শোভা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িত না। শোভার অনুরোধেই হউক, আর আদেশেই হউক, পুলিনের পান খাওয়া বাড়িয়াছিল। নিশীথ বাবু পানে বড় সুপারী খাইতেন, কিন্তু পুলিনের অধিক সুপারী সহ্য হইত না। বিভা আসিবার পর হইতে শোভা পুলিনের পান সাজিবার ভার তাহার হাতে দিয়াছিল। ক্রমে পুলিনের এমন অভ্যাস হইয়া গেল যে বিভা পান না সাজিলেই তাহার সুপারী লাগিত। পুলিন আর কাহারও হাতে পান খাইত না। শোভাও সকল সময়ে বিভার হাতে পান পাঠাইয়া দিত।

এইরূপে দুইমাস কাটিয়া গেল। পুলিনের স্বভাব চরিত্র ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পারিতে ছিলনা। বিভা আসিয়া ধীরে ধীরে যে তাহার হৃদয় অধিকার করিতে ছিল তাহা সে বুঝিতে পারিত না। সে ভাবিত, এক সময়ে একটা উদ্দাম দুর্দ্দমনীয়

আকাঙ্ক্ষা আসিয়া মানব হৃদয়কে মাতাইয়া তুলে, তাহারই নাম প্রেম। সর্ব্বস্বের সহিত সর্ব্বস্ব বিনিময় না হইলে যে প্রেম অঙ্কুরিত হয় না তাহা সে জানিত না। সে তখনও ভাবিত যে সে আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে রহিয়াছে।

৫

এইভাবে দিন কাটিয়া যাইতে দেখিয়া বিভার মাতা শোভাকে বলিলেন "মা কি করে কি হবে? এত দিন বাড়ী ঘর ছেড়ে এসেছি আর কতদিন বিদেশে থাকব? জামায়ের ত মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারা গেল না।" শোভা বলিল "ভয় কি খুড়িমা, আমার অসুধ বেশ ধরেছে, আপনি বিভাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।" বিভা সেখানে বসিয়াছিল, সে ঘোমটা টানিয়া পলাইয়া গেল। তখন বিভার মাতা কহিলেন "দেখ বাছা, আমরা সেকেলে মানুষ, অসুধ বিসুধে বিশ্বাস করি। তুই যখন চিঠি লিখলি যে মাছ জালে পড়েছে, আপনা হতে এসে ধরা দিয়েছে, তখন আমি ভব-ঠাকুর-ঝির কাছে থেকে একটা জড়ি আর একটা ধারণ করিবার অসুধ সঙ্গে নিয়ে এসে ছিলুম। সেই দুটো একবার দিলে হয় না?

শোভা। সর্ব্বনাশ, খুড়িমা, ও কথা মুখেও এনো না। তোমার কি মনে নেই, মুখুয্যেদের জামাই ভয়ানক বখাটে ছিল, মুখুয্যে গিন্নি ভব-পিসির অসুধ খাইয়ে জামাইবশ করতে গিয়ে জন্মের মত পাগল করে দিয়েছেন। আমি পুলিনকে জড়ি-টড়ি খাওয়াতে পারবনা।

বিভা-মা। তবে কি হবে মা? মাদুলীটা ধারণ করাতে পারলে ভাল হত।

শোভা। তোমার জামাইকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

শোভা এই বলিয়া বাহিরে উঠিয়া আসিল, দেখিল বিভা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শোভা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাহার পর বিভাকে জিজ্ঞাসা করিল "খুড়িমা কি বল্লেন শুনেছিস?" বিভা বলিল হাঁ, তাহার পরে প্রাণের ব্যাকুলতায় বলিয়া ফেলিল "দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেন অসুধ টসুধ খাওয়াইওনা। মাদুলী পরিয়ে কাজ নেই, আমার অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই।" শোভা হাসিয়া বলিয়া উঠিল "ইস্, এত? কবে থেকে লো?" বিভা চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল "যাও—তোমার সকলি ঠাট্টা।"

শোভা বিভাকে ছাড়িয়া নিশীথ বাবুকে লইয়া পড়িল, খুল্লতাত-পত্নীর কথা বলিয়া হাসিয়া স্বামীর অঙ্গে লুটাইয়া পড়িল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া, বিভার মাতা কি বুঝিয়া, আর কোন দিন সে কথা উত্থাপন করেন নাই। শোভা তাহার পর হইতে একটা রহস্যের ছুতা পাইয়া গেল, সে কথায় কথায় নিশীথ বাবুকে বলিত "তোমাকে কটা মাদুলী পরিয়ে বশ করেছি বলত?

পুলিনের মনে হইত যে সে ঘরে একা নহে, কে যেন আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে, সে তাহাকে আহ্বান করিবে সেই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ঘরের বাহিরে গিয়া দেখিত কেহই নাই, সে বড় আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। সে একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল যে তাহার চেয়ারে বসিয়া কে একজন ঘুমাইয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখিল প্রভা (অর্থাৎ বিভা)। দেখিয়াই সে দুই পা পিছাইয়া আসিল, তাহার পিছনে একখানা চেয়ার ছিল, পুলিন তাহাতে বাধিয়া পড়িয়াগেল। পতনের শব্দে বিভার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,

পুলিনকে দেখিয়া তাহার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। তাহার হাত হইতে পুলিনের একটা বোতাম বিহীন কামিজ পড়িয়াগেল পুলিন তাহা দেখিল, বিভা লজ্জায় আরও আড়ষ্ট হইয়া গেল। সে পুলিনের ঘরে বসিয়া সেলাই করিতে :করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিল। পুলিনও লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। পড়িয়া গিয়া তাহার বড় লাগিয়াছিল, কিন্তু প্রভার সম্মুখে পড়িয়া গিয়া সে বড় লজ্জিত হইয়াছিল, সেই জন্য উঠিয়া পড়িল। অপ্রস্তুত হইয়া দুইজনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর পুলিনের মুখ ফুটিল, সে বলিল "আপনি বসুন, আমার কাজ আছে, আমি বাহিরে যাব।" প্রভা অর্থাৎ বিভা এক হাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

শোভা বিভাকে কত কথা শিখাইয়া দিয়াছিল, সে বলিয়া দিয়াছিল যদি কোনদিন নির্জ্জনে দেখা হয়, তুই কথা কহিস্, ঘোমটা টানিয়া যেন পালাস্ না। সেও মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে যদি কখনও নির্জ্জনে দেখা হয় তাহা হইলে মন খুলিয়া কথা কহিবে, জিজ্ঞাসা করিবে সেকি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু সে সমস্তই ভুলিয়া গেল, লজ্জা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সে নিবিদ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। অনেকদিন পরে চিরকুমার সভার বাঁধা গৎগুলি পুলিনের মনে পড়িতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রক্তও গরম হইয়া উঠিতেছিল। সে যেই বাহির হইবার জন্য মুখ ফিরাইল, অমনি দেখিতে পাইল ঘোষাল মহাশয় দুয়ারে দাঁড়াইয়া মন্দ মন্দ হাসিতেছেন। পুলিন লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন "কি ভায়া বি—খুড়ি প্রভার সঙ্গে আলাপ হচ্চে?" বিভা ওরফে প্রভা সরিয়া গিয়া প্রাচীরে মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিশীথ বাবু বলিতে লাগিলেন "তা

বেশ বেশ, প্রভা মেয়েটি যেমন শান্ত তেমনি সুন্দরী, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও একটি বর জুটিল না? সেই দুঃখেই প্রভা দিন দিন যেন কাল হয়ে যাচ্চে।" পুলিন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় অকারণে বেজায় হাসিতে আরম্ভ করিলেন। পুলিন ও বিভা দুইজনে আরও অপ্রস্তুত হইয়া গেল। এমন সময়ে শোভা আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিল। সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল "ঠাকুরটি দেখছি সর্ব্বঘটেই আছেন। বাড়ীতে নিরিবিলি কারুর দুটো কথা কহিবার যো নাই।" নিশীথ বাবু বলিলেন "কি জান, বিবাহিত পুরুষের সহিত অবিবাহিতা যুবতীর গোপনে আলাপ করাটা সকলে ততদূর সঙ্গত মনে করে না। তবে আমার তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই।" প্রভা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া তাঁহাকে একটি ছোট কিল্ দেখাইল, তখন হাসিতে হাসিতে কাশিতে কাশিতে ঘোষাল মহাশয় রণে ভঙ্গ দিলেন পুলিন ও বিভা পলাইয়া বাঁচিল।

(৮)

এইরূপে বড় সুখেই কিছুদিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল, যে শোভার ছোট ভগিনীর বিবাহ, তাঁহাদিগের সকলকে দেশে ফিরিতে হইবে। শোভা জেদ করিয়া বসিল যে, পুলিন না গেলে সে যাইবে না। ঘোষাল মহাশয় বলিলেন "পুরাতনে কি আর মন উঠে না?" শোভা রাগিয়া একটি কিল্ দেখাইল, পুলিন সেইখানে বসিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল "দ্বন্দ্ব যুদ্ধটা না হয় পরেই করিবেন? এখন আমার ছুটীনাই, কি করিয়া দেশে যাইব?"

শোভা। তাহা আমি জানিনা, কিন্তু তোমাকে যাইতেই হইবে।

পুলিন। যাইতেই যখন হইবে তখন আর উপায় কি?

ঘোষাল। সুন্দর মুখেই সর্ব্বত্রই জয়।

শোভা তাহাকে পুনরায় একটি কিল্ দেখাইল। স্থির হইয়াগেল যে ছুটী না পাইলেও পুলিনকে ছুটী লইতে হইবে। যথাসময়ে যাত্রা করিয়া সকলেই দেশে আসিলেন, যাত্রার পূর্ব্বে পুলিন দেখিল যে কে তাহার কাপড়চোপড়গুলি ট্রঙ্কে ও ব্যাগে গুছাইয়া রাখিয়াছে, দেখিয়াই সে বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ভয়ে পুলিন ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে প্রথমদিন জেদ ধরিল যে সে অন্দরমহলে শয়নকরিবেনা, কিন্তু শোভার হাত এড়াইতে পারিল না। অপরাহ্নে অন্দরমহলে একখানি পুরাতন ফটোগ্রাফ দেখিয়া তাহার মন বড় খারাপ হইয়া গেল। ফটোগ্রাফখানি তাহার ও বিভার, বিবাহের সময় তোলা। বিভাকে তাহার কিছুমাত্র মনে ছিল না, কিন্তু সে ছবির সহিত প্রভার সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সে শুনিয়াছিল যে বিভার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু পাটনায় প্রভার মাথায় দুই একদিন সিঁদুরের দাগ দেখিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করায় ঘোষাল মহাশয় বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের দেশে আইবুড় মেয়েরা অল্প সিঁদুর পরিয়া থাকে, বিবাহ হইলে চওড়া করিয়া সিঁদুর পরে। মনে মনে এইসব কথা তোলাপাড়া করিয়া পুলিনের বড় সন্দেহ হইল, সে ভাবিল যে হয়ত তাহার ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য একটা চক্রান্ত হইয়াছে। সেই জন্যই শোভা তাহাকে ভুলাইয়া পাটনা হইতে লইয়া আসিয়াছে। তাহার মনে কেমন সন্দেহ হইল, সে বলিয়া পাঠাইল যে, তাহার শরীর ভাল নহে, সে কালই পাটনায় ফিরিবে।

এই সংবাদ শুনিয়া শোভা ভয় পাইল, সে ভাবিল. শিকার বুঝি বা হাত ছাড়িয়া পালায়। তখন শোভা তাহার তূণ হইতে মৃত্যুবাণটি টানিয়া বাহির করিল। সে তখন হইতে বিভাকে শিখাইতে বসিল, অনেক চেষ্টার পরে তাহাকে পাখীর মত পড়াইয়া সাজাইয়া গোজাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রাত্রিতে আহারের সময় পুলিন বিস্মিত হইয়া দেখিল যে সেখানে র কেহই নাই, কেবল সুসজ্জিতা হইয়া প্রভা দাঁড়াইয়া আছে। হাকে দেখিয়া পুলিন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা তাহার কেমন াল ঠেকিতেছিল না, সে জিজ্ঞাসা করিল "ঘোষাল মশাই কোথায়?" প্রভা কোন উত্তর না দিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। উত্তর না পাইয়া পুলিন অস্থির হইয়া পড়িল, তাহার মন তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইতে াহিতেছিল, বলিতেছিল এখানে তোমার বড় বিপদ, তুমি এখানে থাকিও না, ইহারা তোমার ব্রত ভঙ্গ করিবে। আবার কাহার অব্যক্ত হৃদয় বেদনা, কাহার অস্ফুট করুণ ক্রন্দন আসিয়া যেন তাহার পায়ে জড়াইয়া ধরিতেছিল, বলিতেছিল তুমি যখন আসিয়াছ তখন আর যাইতে পাইবেনা, তুমি ছাড়া এজগতে আর আমার বলিতে কেহ নাই।

বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিয়া পুলিন পলায়ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল, মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল "আমি বাহিরে যাই।" তখন হঠাৎ প্রভা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল "না।" বিস্মিত হইয়া পুলিন জিজ্ঞাসা করিল "কেন প্রভা?" প্রভা অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বলিল "আমি প্রভা নই, আমি বি—বি—বিভা।" সে টলিতেছিল, পুলিন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, সে না ধরিলে বিভা বোধহয় পড়িয়া যাইত।

পুলিন তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল, বিভা তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহির হইতে দুয়ারের শিকল টানিয়া দিয়া শোভা বলিল "দূর পোড়ারমুখী, এত করিয়া **বশীকরণের** মন্ত্র শিখাইলাম, পড়াইলাম, সব ভুলেগেলি? তা হোক কাজ হইলেই হ'ল। এখন পাখীটাকে খাঁচায় তোল।"